প্রকাশক :
শ্রীপ্রেমময় মজুমদার
৪৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : ২৫শে, বৈশাখ, ১৩৬৭

বেঁধেছেন :
সারদা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস।
১০, স্থর্য সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রক :
শ্রীনীরদ চৌধুরী
নববিধান প্রেস
৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

সাহিত্যিক শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্রদ্ধাভাজনেষু

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচারের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। গ্রন্থটি কিছু সংস্কৃত হলেও মূল বক্তব্যে কোনো পরিবর্তন আসে নি। বন্ধুবর শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থটির মুদ্রণ সংশোধনে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

ক্ষেত্র গুপ্ত

২৮ এ, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন।
কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার।
মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্য-শিল্প।
নাট্যকার মধুসূদন।
কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী।
মধু বিচিত্রা।
কবি মুকুন্দরাম।
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।
পুরাতন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়

ঝড়ের যুগ, অল্প জীবন

It is no use blinking the fact that we are passing through a revolutionary period...We are by instinct and tradition averse to revolutions. Traditionally, we are a slow-going people ; but when we decide to move, we do move quickly and by rapid strides. No living organism can altogether escape revolutions in the course of its existence.

—Lajpat Rai : Presidential address, National Congress, 1920.

॥ এক ॥

রবীন্দ্র-অনুজ বাঙালি কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ এককালে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বহু বিচিত্র কবিতার রচয়িতা তিনি—ভাষা, ছন্দ ও শব্দপ্রয়োগের উজ্জ্বল অভিনবত্বে তৎকালীন পাঠকদের কিছুটা চমকেও দিয়েছিলেন। ছন্দের যাদুকর, অপ্রতিদ্বন্দ্বী শব্দশিল্পী হিসেবে তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেকালের বিস্তর কাব্য-রসিক সমালোচক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ভক্ত কবি-শিষ্যের অকালমৃত্যুর অব্যবহিত পরে লেখা এক বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন—

তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী-'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন স্বর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে।

১৯০০ সাল থেকে শুরু করে আমৃত্যু অর্থাৎ ১৯২২ সাল পর্যন্ত অজস্র কবিতা তিনি লিখেছেন। অনুবাদও করেছেন প্রচুর। চৌদ্দটি কাব্যগ্রন্থে এই সব রচনা সঙ্কলিত হয়েছে। এই প্রাচুর্যের দিকে তাকিয়ে সংশয়াতীতভাবে বলা চলে, কবির কাব্যলক্ষ্মী কৃপণা ছিলেন না। মাত্র চল্লিশ বছরের জীবনে এর চেয়ে অধিকতর (অন্তত সংখ্যার দিক থেকে) সম্পদে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করার উদাহরণ খুব বেশি নেই। কাজেই বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী যদি কাব্যসাহিত্যের এ-জাতীয় রচনাপ্রাচুর্যের প্রতীক হয় তবে সত্যেন্দ্রনাথের হাতে তাতে একটি তন্ত্র বাঁধা হয়েছে, এমন বলাও যেতে পারে। কিন্তু ভারতীদেবীর হাতের বীণায় সৌন্দর্যের রাগিণী ছাড়া অন্য কিছু বাজে না এ রকমই শোনা যায়। নিছক প্রাচুর্যের সেখানে দাম নেই ; এমন কি ইতিহাসের বিচারও সে-পর্যন্ত পৌঁছায় না। তাই রবীন্দ্রনাথের উচ্চারিত "একটি অপূর্ব তন্ত্র" বাঁধার কথাটিতে সমালোচকের পক্ষে বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন। এতে পরম স্নেহাস্পদ কবি-অনুজের প্রতি যতটা প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, রসজ্ঞ সমালোচকের সিদ্ধান্ত ততটাই নীরব থেকে গিয়েছে।

পাঠযোগ্য ভাল কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ অনেক লিখেছেন। এসব রচনায় শব্দনির্বাচনে ও অঙ্গসজ্জায়, ছন্দোনির্মাণে ও বাচনভঙ্গিতে একটা প্রেক্ষণীয় পারিপাট্য অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য, এই পারিপাট্য বা প্রসাধনকলার দক্ষতা, এই স্বচ্ছন্দ, সচেতন পরিচ্ছন্নতা কাব্যাত্মার সঙ্গে কতখানি জড়িত। অর্থাৎ, একি কেবলই বহিরঙ্গসর্বস্ব কারুকর্ম (Craft), না চারুশিল্পের (Fine Art) পর্যায়ে উন্নীত। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরেই শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের কবিকৃতির সার্থকতার পরিমাপ। তবে একথা

আগে থেকেই বলা যায় যে রবীন্দ্র-অনুকারীদের মধ্যে কবিতার কায়ানির্মিতিঘটিত যে শিথিলতা সর্বব্যাপক ছিল, শিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তার সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। ভাবের বিষয় বলেই কাব্য সতর্ক-সচেতন কলা-বিধির অপেক্ষা রাখে না, এই অভিমত তিনি কদাপি শ্রদ্ধেয় বলে মনে করেন নি। অন্তত এই একটি দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথ সে যুগটিকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত অতি-আধুনিক কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কবি-ব্যক্তিত্বের কোন নির্দিষ্ট আকার আছে কিনা সে-বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সেই প্রশ্নে প্রবেশ না করলে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপরিচয় গভীরতা পাবে না। কিন্তু কারও কবি-ব্যক্তিত্বের পরিচিতির জন্য কতক পরিমাণে সেই যুগ ও তাঁর ব্যক্তিজীবনের ভূমিকা প্রয়োজন।

॥ দুই ॥

১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম, ১৯২২ সালের জুন মাসে তাঁর মৃত্যু। ১৯০০ সালে তাঁর প্রথম কাব্য প্রকাশিত। মৃত্যু পর্যন্ত সমান বেগে তিনি কবিতা লিখে চলেছেন। ১৯০০ সালে 'সবিতা' নামে তাঁর প্রথম কাব্য প্রকাশিত হলেও তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্য 'বেণু ও বীণা'র প্রকাশকাল ১৯০৬ সাল। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার এই সমগ্র কালটি ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত প্রাণ-চঞ্চল। শুধুমাত্র ভারতের ইতিহাসেই নয়, পৃথিবীর সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসেও এই কাল-সীমা ক্রান্তি-চিহ্নে উদ্দীপ্ত। সত্যেন্দ্রনাথের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের নির্মিতিতে দেশের ও বিশ্বের যুগেতিহাস কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা বিচার্য।

যুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হল ১৯১৪ সালে। আরও কয়েক বছর আগে থেকেই বাতাসে বারুদের গন্ধ ছড়াচ্ছিল একথা নিশ্চিত। ১৯১৪-১৮-এর মহাসমর মানচিত্রে বর্ণের পরিবর্তন আনল; রক্ত-ধ্বংস-চোখের জলের প্রবাহ দিগন্ত মেঘাচ্ছন্ন করল; মানুষের বুদ্ধি ও অনুভূতির প্রান্তরে মহাকালের রথচক্রের স্থায়ী ও গভীর ক্ষত সৃষ্টি হল। পণ্ডিতদের মতে ১৯০০ সাল থেকে নয়, প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকেই আসলে বিংশ শতকের আরম্ভ।

উনবিংশ শতাব্দীর 'ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুসন' যুরোপের মানসিক চিন্তাকে ভবিষ্যতের আশায় মুখর করে তুলেছিল। সেকাল পর্যন্ত মানবজাতির নিয়তি সম্বন্ধে ব্যাপক সংশয়ের কারণ ঘটে নি। এখানে-সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ সংঘর্ষ চলেছে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণে পৃথিবীর বহু অংশে বেদনা ও বিক্ষোভ জাগছিল। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র যুরোপে তার ফলে 'মেটিরিয়াল প্রস্পারিটি' বেড়েই চলেছে, ঘাটতি পড়ে নি। শোষিত দেশগুলির সে-সঙ্কট মানবসভ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগায় নি যুরোপীয় সংস্কৃতি-আচার্যদের মনে। কিন্তু এই কেন্দ্র যখন লোভে, হিংস্রতায়, বেয়নেটে, বোমায় বিধ্বস্ত হল, তাঁরা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের মূল্যবোধ, সর্বজনীন কল্যাণচেতনা, রাজনৈতিক গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক সমাজবাদ আদর্শ হয়ে উঠেছিল। যন্ত্র-বিজ্ঞানের অসীম সম্ভাবনায় তাঁদের স্বপ্ন ছিল রঞ্জিত। সাহিত্য-শিল্পে সত্য-শিব-সুন্দরে বিশ্বাস অবসিত হয় নি। যুরোপের সাহিত্যে একটা ব্যাপক ক্ষেত্রে রিয়ালিজম্ প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু ফ্লবেয়র থেকে টলস্টয় পর্যন্ত মানবিক সুস্থতার বিরুদ্ধে তাকে বিদ্রোহী হতে দেখা যায় নি।

বিংশ শতকে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং দার্শনিক বিশ্লেষণ ঊনবিংশ শতকের চিন্তাজগতের নিশ্চিত পরিবর্তন সূচিত করল। Radio-activity-সংক্রান্ত আবিষ্কারগুলি পদার্থবিদ্যার পুরাতন সূত্র পালটে দিল; ক্রমে হাইজেনবার্গের Principle of Indeterminacy বস্তু-বিজ্ঞানের রাজ্যে অনিশ্চয়তাকে সিংহাসন ছেড়ে ছিল। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বও যান্ত্রিক জড়বাদকে আঘাত করল। জ্যোতির্বিদ্যার নব নব আবিষ্কার মানবচিন্তার উপর গুরুতর প্রভাব ফেলল। বিপুল বিশ্বের পটভূমিতে মানবজীবনের তুচ্ছতা প্রতিপাদিত হল। অথচ রেনেসাঁসের পরবর্তীকালে এই মানবজীবন ও তার গহন গভীর রহস্যই ছিল ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে। নব আবিষ্কার প্রমাণ করল জীবন ব্যাপারটাই আকস্মিক, নিষ্করুণ নিসর্গ ভূমিকায় তার নীরব উৎসাদনই অনিবার্য সত্য। জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব সর্বত্রই পুরাতন প্রত্যক্ষ জীবনসত্য ও মানবপ্রাধান্যে সংশয় দেখা দিল। ফ্রয়েডের আবিষ্কার মানবের অন্তর্লোককে উদ্ঘাটিত করল। মানুষের বহু সৎ ও রোমান্টিক অনুভূতি এবং সৌন্দর্যচেতনার পেছনে অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষার ভূমিকাটিকেই সত্য বলে স্বীকার করা হল।

এই ভাবধারা একালের সাহিত্যচেতনার ভিত্তিটিকে পর্যন্ত পরিবর্তিত করে দিল। কবিতার বিষয়ে তথ্য আঙ্গিকে স্পষ্টরেখ স্বাতন্ত্র্য দেখা গেল। কাব্যভাষা ও গদ্যভাষার মধ্যে প্রচলিত সীমারেখা মুছে দেওয়া হল। কাব্যানুভূতি গদ্যচিন্তনের নৈকট্য পেল; কোথাও কোথাও এদের মধ্যে বিচিত্র আনুপাতিক মিশ্রণ ঘটল। বুদ্ধির প্রাধান্য আবেগের উপরে অধিকার বিস্তার করতে চাইল। জ্ঞানবিজ্ঞানের সীমা আদিগন্ত প্রসারিত হওয়ায় তার প্রতিফলন ঘটল কবিতায়। জটিল আত্মকেন্দ্রিকতা, একান্ত ব্যক্তিগত

সংশয় ও যন্ত্রণার বোধ আরও ব্যক্তিলক্ষণযুক্ত ভাষারূপে ধরা পড়তে লাগল। এলিয়টের ভাষায়, "Our civilization comprehends great variety and complexity playing upon a refined sensibility, must produce various and complex results. The poet must become more and more comprehensive, more allusive, more indirect in order to force, to disolate if necessary, language into his meaning."

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে য়ুরোপে এলিয়ট-পাউণ্ডের কবিতার মধ্যে এই বিংশ শতকীয় আধুনিকতা প্রতিষ্ঠা পেল।

বিংশ শতকের প্রথম ভাগে অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমগ্র য়ুরোপ তথা এশিয়াবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তা হল রুশ দেশে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য। একদিকে ধনতন্ত্রী সভ্যতা প্রথম মহাযুদ্ধে ছিন্নমস্তা, অন্যধারে শোষণহীন নবসভ্যতার আশার সূর্য উঠল রাশিয়ায়। সাম্রাজ্যবাদের শোষণে ক্লিষ্ট দেশগুলিতে নব ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আনল এই বিপ্লব। কিন্তু ১৯২২ সাল (সত্যেন্দ্রনাথের জীবৎকালের সীমায় যুগধর্মের পর্যালোচনাই আমাদের লক্ষ্য। ১৯২২ সালে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।) পর্যন্ত রাশিয়ায় নব-ব্যবস্থা স্থিতি লাভ করে নি, অর্থনৈতিক সাফল্য লক্ষ্যগোচর হয় নি। তখনও ভাঙার পালা চলছে। য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আক্রমণের প্রতিরোধে এই নব সমাজবাদী দেশের সর্বশক্তি নিয়োজিত। গঠনমূলক কর্মে তার কৃতিত্ব তখনও প্রকাশিত নয়; তবুও সাধারণভাবে উপনিবেশগুলিতে এবং ধনবাদী দেশের শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর মধ্যে কিছু ভরসার সঞ্চার হল। বুদ্ধিজীবীদের সংশয় ও নৈরাশ্যের বিপরীতে শ্রমজীবীদের মনে কিছু সম্ভাবনা উঁকি মারতে লাগল। কিন্তু য়ুরোপীয় চিন্তাবিদ্‌গণ রুশবিপ্লবকে সুনজরে দেখলেন না। প্রথমত, সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে,

একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, চিন্তার তথা শিল্পের স্বাধীনতা অস্বীকৃত হয়, সব কিছুই রাষ্ট্রশক্তির তাঁবেদারীতে পরিণত হয়, এই ভেবে তাঁরা শঙ্কা বোধ করলেন। তাছাড়া বিপ্লবের নিষ্ঠুর রক্তপাত অনেককে বিমর্ষ করল।

বিশ্বপরিস্থিতি চিন্তারাজ্যে যে নব দিগন্ত খুলে দিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। ভারতে এর কি প্রতিক্রিয়া হল, সমকালীন বাংলা কবিতায় বিংশ শতকের ইংরেজী কবিতার কি প্রভাব পড়ল তার বিচারই সত্যেন্দ্র-কবিজীবনের যোগ্য ভূমিকা।

এক। য়ুরোপীয় ধনবাদী সভ্যতার বিপর্যয়ে ভারত তত কাতর হল না; সমগ্র মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্ছিদ্র নৈরাশ্য সে বোধ করল না। জড় যান্ত্রিকতা ও 'মেটিরিয়াল প্রস্পারিটি'র অতিচর্চা আপনার স্ফীত লোলুপতায় নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে এরূপ বিশ্বাস ভারতীয় চিন্তানায়কদের পূর্ব থেকেই ছিল। ফলে ইংরেজী নব্য কবিতা যে মনন-ভিত্তিতে জন্ম নিয়েছে ভারতের পক্ষে সমকালে তা ততখানি বাস্তব ছিল না।

দুই। ভারতে এই পর্বে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যাপকতায় ও তীব্রতায় চরমে উঠল। এই তরঙ্গোদ্বেলতা ও অস্থিরতার মধ্যেও এদেশবাসীর লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যত আশার দিকে প্রসারিত। এই আলোক ভেদ করে য়ুরোপীয় সমকালীন অবক্ষয় এ-দেশের পটভূমিতে বাস্তব হয়ে উঠতে সময় লাগবার কথা।

তিন। রবীন্দ্রনাথের বিপুল ব্যক্তিত্ব ও অত্যুচ্চ কবিত্বশক্তি বাঙালি কবিদের উপরে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যাতে য়ুরোপীয় নব কাব্যচেতনার অনুসরণ বিলম্বিত না হয়ে পারে নি।

য়ুরোপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই রোমান্টিকতা পুরাতন ও পরিহার্য কাব্যবোধ হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্র-রোমান্টিক কল্পনা বিংশ শতক পর্যন্ত তাকে এদেশে সজীব রেখেছে। অথচ য়ুরোপীয় অত্যাধুনিকতার কোনো কোনো সূত্র রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কখনও সৌন্দর্যচেতনা, কল্যাণবোধ ও মানব-বিশ্বাস থেকে তিনি ভ্রষ্ট নন। ফলে দীর্ঘকাল য়ুরোপীয় নব্য আধুনিকতা আমাদের কাব্যক্ষেত্রে আসে নি।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিজীবনকে য়ুরোপীয় আধুনিক মনন ও কাব্য-সৃষ্টির পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমত, য়ুরোপীয় নব চিন্তার অংশীদার সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর চিন্তাচেতনায় পুষ্ট তাঁর মন চরকা-সত্যাগ্রহে বিশ্বাস করত, বিশ্বমানবের মৈত্রীর ও কল্যাণের কথা ভাবত, মানবমূল্যবোধে তাঁর শ্রদ্ধা তখনও অবিচল ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের বিপর্যয় থেকে ইতিহাসের চিরকালীন শিক্ষা লাভ করেই তিনি তৃপ্ত রইলেন। বার বার অত্যাচার ও লোভের আসন এমনি করেই টলে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, রুশ বিপ্লব তাঁকে কতটা সাম্যমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল বলা কঠিন। নজরুলের কাব্যে ও জীবনচেতনায় ১৯২০-এর কাছাকাছি সময় থেকেই রুশবিপ্লবের কিছু প্রভাব এসে পড়েছিল। সত্যেন্দ্র-নাথের কিছু কিছু কবিতায় শ্রমজীবীদের প্রতি যে প্রীতি প্রকাশিত, সাম্যের যে আদর্শ ঘোষিত তা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের (Utopian Socialism) মানবিক বোধ থেকে এসেছে, রুশীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র (Scientific or Marxian Socialism) থেকে তার পার্থক্য স্পষ্ট।

তৃতীয়ত, ১৯৩০-এর কাছাকাছি সময়ে বাংলা কবিতায় বিংশ শতকীয় আধুনিকতা প্রতিবিম্বিত হতে থাকে।* সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে ১৯২২ সালে। সত্যেন্দ্রনাথ যে ভাব ও রূপের পরিধিতে আবর্তিত তার মধ্যে নব্য লক্ষণের কিছুমাত্র প্রবেশ ঘটে নি।

চতুর্থত, সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতাগুলির দিকে তাকালে য়ুরোপীয় কবিকুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা জানা যায়। কিন্তু বিংশ শতকের কবিদের রচনার অনুবাদের সংখ্যা একান্ত অল্প। সমকালের নূতন ভাবনা ও রীতির কবিদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল এমন সংবাদ তাঁর বহুসংখ্যক অনুবাদ-কবিতাগুলি দেয় না।

॥ তিন ॥

১৯০৫ থেকে ১৯২২ সাল বাংলা দেশ তথা ভারতের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপুর্ণ ঐতিহাসিক কাল বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুর্ববর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে তিনটি মুখ্য আন্দোলনের জোয়ার এসেছে তাদের প্রথম দুটি উপরোক্ত কালসীমায় বদ্ধ। ১৯০৫ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে প্রথম সংগ্রামতরঙ্গ সারা দেশকে আলোড়িত করেছিল। ১৯১৯-২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন আসমুদ্র হিমাচলকে দ্বিতীয় বারের জন্য কম্পিত করে তুলল। তৃতীয়বারে দেশব্যাপী বিক্ষোভ-চাঞ্চল্য দেখা দিল ১৯৩০-৩৪ সালে। তৃতীয় আন্দোলনের ভারতবর্ষ সত্যেন্দ্রনাথের জীবৎকালের সীমাবহির্ভূত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ভারতে স্বাদেশিক আন্দোলনের যে প্রকৃতি ছিল তাকে চূড়ান্ত নিয়মতান্ত্রিক এবং বৃটিশ নব সভ্যতার মোহে তদ্গতচিত্ত বলে আখ্যাত করা চলে।

স্বায়ত্তশাসনের দাবি নয়, সামান্য শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন, লাট-সাহেবদের সচিবসংস্থায় তথা ব্যবস্থাপরিষদগুলিতে কিছু ভারতীয় আসন লাভই ছিল আমাদের কাম্যস্বর্গ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখেলের এই নরমপন্থী নীতির বিরুদ্ধে বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লাজপৎ রায় প্রমুখ চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ নবধারায় আন্দোলন পরিচালনা করতে চাইলেন। পুরাতন পন্থার আপোষ পরিহার করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে চরম সংগ্রাম করার আদর্শ তাঁরা গ্রহণ করলেন। অবশ্য পশ্চিমী সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াকে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন।

১৯০৫ সাল এই দুই ধারার মসৃণ নীতিগত বৈপরীত্যের উপরে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার তরঙ্গচাঞ্চল্য নিয়ে এল। লর্ড কার্জন পরিকল্পিত বঙ্গভঙ্গ তাঁর উত্তরাধিকারীর শাসনকালে কার্যকর হল। দেশব্যাপী ঘৃণা ও বিক্ষোভের ঝড় উঠল। ১৯০৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেস সম্মেলনে চরমপন্থীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ ঘোষিত হল ("the system of Government obtaining in the self governing British Colonies"); বিদেশী-বর্জন তথা দেশীয় শিল্প গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে 'স্বদেশী'-পণ্যের সমর্থন নীতি ও কর্মপদ্ধতিরূপে গ্রহণ করা হল। জাতীয় শিক্ষার প্রসার কংগ্রেস-প্রোগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরম পন্থীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তাদের প্রকৃত পুনর্মিলন আর ঘটে নি। পরবর্তীকালে নরমপন্থীরা কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছিল।

১৯০৫-এর আন্দোলনে বৃটিশ সরকারের নিপীড়ন চরমে উঠল। বিনা বিচারে দীর্ঘকাল আটক রাখা থেকে শুরু করে জাতীয় সঙ্গীত

গাইবার অপরাধে বিদ্যালয়ের বালকদের গ্রেপ্তার করা, শত শত রাজনৈতিক মামলায় আদালতগুলিকে ভরে ফেলা—সর্ববিধ দমন-নীতির আশ্রয় তারা গ্রহণ করল।

১৯০৭-৮ সাল থেকে বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দেখা দিল। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীরা মৃত্যুর মূল্যে অমর হলেন। সরকারী নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণে বেড়ে গেল।

অবশেষে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হল; বয়কট আন্দোলন অংশত সফল হল।

ভারতীয় স্বরাজ-আন্দোলন উজ্জ্বলতর পর্যায়ে উঠল ১৯১৯-২২ সালের অসহযোগ-আইনঅমান্য সংগ্রামে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বৃটিশ সরকারের সামরিক কার্যকে সমর্থন করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাগত গান্ধীজী সৈন্যসংগ্রহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং একদল সেবাব্রতী কর্মীদল নিয়ে সেবাকার্যের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার প্রস্তাবও করেছিলেন। এই পথেই স্বরাজ আসবে এ-ঘোষণা করতেও তাঁর বাধে নি।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের উচ্চতর স্তরের প্রীতিবিগলিত, আপোষ-মূলক মনোভাব জনসাধারণকে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, বেকারী ও যুদ্ধ-অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ও তীব্র শোষণ থেকে মুক্ত করতে পারে নি। তাদের মধ্যে ঘনায়মান বিক্ষোভ বারংবার বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টায় মুক্তি পাচ্ছিল। পাঞ্জাবের গদর আন্দোলন এবং সেনাবাহিনীর কোনো কোনো অংশের বিদ্রোহদমনে বৃটিশ সরকার চূড়ান্ত নির্যাতন-মূলক পন্থার আশ্রয় নিল।

এই সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুক্ত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আংশিক স্বায়ত্তশাসন লক্ষ্য বলে ঘোষিত হল। বৃটিশ সরকার শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের নামমাত্র সুযোগ দিয়ে "দ্বৈতশাসন" জাতীয় একটি প্রস্তাব উপস্থিত করল। ইতিহাসে "মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট" নামে এটি পরিচিত। কয়েক বছর পূর্বে নরমপন্থী-চরম-পন্থীদের যে সাময়িক মিলন ঘটেছিল ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তাতে ফাটল দেখা দিল। নরমপন্থী নেতৃত্ব ১৯১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেস সম্মেলনে শ্রদ্ধাবিগলিত চিত্তে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড-সংস্কার গ্রহণের পক্ষে মত দিল। কিন্তু পরের বছরেই বোম্বাই কংগ্রেসে চরমপন্থীদের প্রাধান্য স্থাপিত হল। কলকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী নিন্দিত হল। গান্ধীজী ব্যতীত অপরাপর নরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করলেন।

কংগ্রেসের দোদুল্যমান মনোবৃত্তি কিন্তু জনসাধারণকে তৃপ্ত করতে পারল না। ১৯১৮-১৯ সালে দেশজোড়া ধর্মঘটের উত্তালতা দেখা দিল। শাসকেরা তখন রাওলাট আইন বিধিবদ্ধ করল। সরকারের তূণে দমন নীতির ব্রহ্মাস্ত্রগুলি তুলে দেওয়া হল। গান্ধীজী নিষ্ক্রিয় সত্যাগ্রহের মাধ্যমে প্রতিবাদের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন। আসমুদ্রহিমাচল হরতাল, ধর্মঘট, সভা-শোভাযাত্রা, বর্বর নির্যাতন ও সাহসী প্রতিরোধে কেঁপে উঠতে লাগল। এই সময়ে অমৃতসরে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ এক জনসভায়—জালিয়ানওয়ালা-বাগের ঘেরাও করা ময়দানে—জেনারেল ডায়ার নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে বহুসংখ্যক লোককে হতাহত করল। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া যে কত গভীর ও মর্মদাহী হয়েছিল নাইট উপাধি ত্যাগ করে লেখা রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত পত্রে তার চমৎকার প্রতিফলন মিলবে,—

"Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble

vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror."

অব্যবহিত পরে সারা দেশে গণআন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠল। ১৯২০ সালের প্রথম ছয়মাসের মধ্যে অন্তত দুশ' ধর্মঘটে পাঁচ লক্ষ লোক যোগ দিয়েছিল। অবশেষে কংগ্রেস নেতৃত্ব অহিংস অসহযোগের নীতি গ্রহণ করল। কংগ্রেসের মূল লক্ষ্যেরও পরিবর্তন ঘোষিত হল। "Colonial self government within the Empire" থেকে "the attainment of Swaraj by peaceful and legitimate means" হয়ে দাঁড়াল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনের চরম উদ্দেশ্য। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রস্তাব পরিত্যক্ত তো হলই, বৃটিশ পণ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আদালত, নির্বাচন সব কিছু বয়কটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

এই আন্দোলন ক্রমে এমন একটা পর্যায়ে উঠল, জনসাধারণের প্রায় সর্বস্তরে এমন ব্যাপকতা লাভ করল যে স্বরাজলাভের আসন্ন তারিখ ঘোষণা করতেও দ্বিধা করলেন না গান্ধীজী। অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি কতকগুলি ক্ষেত্রে কৃষক সম্প্রদায়ের গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিল। প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারতভ্রমণকালে সারা দেশ নিশ্ছিদ্র হরতালে ক্রোধ ও ঘৃণার সম্বর্ধনা জানাল। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়ে তরুণ শ্রেণীকে নবযৌবনমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তুলল।

বৃটিশ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। স্বেচ্ছাসেবক দল বেআইনী ঘোষিত হল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের দলে দলে জেলে পাঠান

হতে লাগল। আপোষ রফায় পৌঁছুবার সূত্র খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে উঠল সরকারপক্ষ।

বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রামী জনসাধারণ মহাত্মা গান্ধীকে অনুরোধ করতে লাগল খাজনাবন্ধ আন্দোলন শুরু করবার জন্য। অবশেষে পরীক্ষামূলকভাবে একটি জেলায় গণ-আইন-অমান্য সংগ্রাম আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এমন সময়ে সংবাদ এল চৌরীচৌরায় ক্রুদ্ধ কৃষকগণ থানা পুড়িয়ে দিয়েছে, বাইশ জন পুলিশের লোক নিহত হয়েছে। গান্ধীজী ব্যথিত হয়ে গোটা অসহযোগ আন্দোলনই তুলে নিলেন।

এই ঘটনায় স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী জনসাধারণই শুধু হতাশ হল না, কারারুদ্ধ নেতৃবৃন্দও বিমূঢ় ও ব্যথিত হলেন। সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন, "To sound the order of retreat just when public enthusiasm was reaching the boiling point was nothing short of a national calamity. The principal lieutenants of the Mahatma, Deshabandhu Das, Pandit Motilal Nehru and Lala Lajpat Rai, who were all in prison, shared the popular resentment. I was with Deshabandhu at the time, and I could see that he was beside himself with anger and sorrow."—(The Indian Struggle.)

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্ক ছিল না এমন নয়, তবে তাকে খুব ঘনিষ্ঠ বলা চলে না। তিনি ১৯০৫-এর বা ১৯২১-এর আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। তবে আন্দোলনের নানা পর্যায়ে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড তাঁকে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ করেছিল এমন প্রমাণ আছে। তার প্রতিক্রিয়া বহু কবিতার জন্ম দিয়েছে,

আন্দোলনের পরিধির মধ্যে তাঁকে নিয়ে আসে নি। গান্ধীজীর নেতৃত্বে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁত-চরকার আদর্শকে, বিদেশী-শিক্ষা বর্জনকে তিনি কতটা মনেপ্রাণে সমর্থন করতেন তা অবশ্য শুধু কবিতা দিয়ে বোঝা কঠিন। এসব বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গুরুতর পার্থক্য ছিল। একই সঙ্গে দুজনের প্রতি অটুট ভক্তি বজায় রাখা কি করে সম্ভব হয়েছিল ভাববার মত। চরম মুহূর্তে গান্ধীজীর অকস্মাৎ অসহযোগ ও আইনঅমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ায় বাংলার প্রধান নেতারা (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ) দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভক্তিতে ভাঙন ধরেছিল কিনা জানা যায় না। গান্ধীজীর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের নীতি ও পদ্ধতিগত পার্থক্য ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের চিত্তরঞ্জন-বিরোধিতার ভিত্তি ছিল দেশবন্ধুর সাহিত্যিক মতামত। রাজনীতি-চিন্তায় তার প্রভাব পড়েছিল কি? এইসব সমস্যা আমাদের ভাবায়, কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা এখনও সম্ভব হয় নি।

॥ চার ॥

সত্যেন্দ্রনাথের জীবন-কাহিনীর গ্রহণযোগ্য তথ্যভিত্তিক কিন্তু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা"র অন্যতম পুস্তিকায়। শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র তাঁর গবেষণা-গ্রন্থে আরও কিছু তথ্য সঙ্কলনের সাহায্যে সেই কাঠামোকে অনেকাংশে পূর্ণতা দিয়েছেন। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমি সত্যেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী বিবৃত করেছি। প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য উপরোক্ত দুটি রচনা থেকেই সঙ্কলিত। সে বিষয়ে আমার গবেষণার দাবি নেই। তবে কবির অন্তর্জীবনের যে মূর্তিটি কল্পনা করা হয়েছে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ বর্তমান লেখকের।

১৮৮২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী চব্বিশ পরগণা জেলার নিমতা গ্রামে মাতুলালয়ে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর পিতার নাম রজনীনাথ দত্ত, মাতার নাম মহামায়া দেবী। তাঁর পিতামহ ছিলেন বাংলা গদ্যের আদিযুগের অন্যতম প্রধান পুরুষ মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত।

সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যকাল কেটেছিল কলকাতায়। দু-একবার মধুপুরে বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছেন। পড়তেন সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে। ছাত্র হিসেবে বিশেষ সুনাম অর্জন করতে পারেন নি তিনি। ১৮৯৯ সালে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ১৯০১ সালে জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্স্টিটিউশন থেকে তৃতীয় বিভাগে এফ. এ. পাশ করেন।

স্কুলে ছাত্রজীবনে দু-একটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ হাত দিয়েছিলেন, কলেজে পাঠকালে 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির প্রভাবে তিনি গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর সাহিত্যিক প্রবণতার পেছনে মাতুল কালীচরণ মিত্রের ভূমিকাও অনুল্লেখ্য নয়।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং বৎসরকাল পরে কনকলতা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বি. এ. পরীক্ষায় তিনি পাস করতে পারলেন না। আবার পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। মামার ব্যবসায়ে তিনি যোগ দিলেন, এবং বিশেষ আকর্ষণ অনুভব না করায় কিছুকাল পরে তা পরিত্যাগ করলেন। সত্যেন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে সম্পূর্ণত কাব্যলোকের অধিবাসী।

'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তাঁর অনেক মৌলিক ও অনুবাদ–

ধর্মী কবিতা প্রথম এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রথম যৌবন থেকেই যাঁদের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রমোহন বাগচির। এঁদের সাহচর্যে উত্তেজনাহীন নৈমিত্তিক জীবনচর্যা সহজপথে প্রবাহিত হচ্ছিল। কবিতারচনা ও কাব্য-প্রকাশ চলছিল মোটামুটি নিয়মিতভাবে। 'সাহিত্য' ব্যতীত 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকার বিশিষ্ট লেখকশ্রেণী-মধ্যেও তিনি গণ্য হলেন। এই পত্রিকার সাহিত্যিক গোষ্ঠিগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া একালে তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্তি উৎসবের তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী। ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের কাশ্মীর ভ্রমণকালে তিনি তাঁর সাহচর্যের সুযোগ পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দের বিরূপতা এক সময়ে তীব্র হয়ে উঠেছিল। পত্রপত্রিকায় সাহিত্য-নীতি নিয়ে লড়াই তো চলছিলই, ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকেও রবীন্দ্রনাথ রেহাই পান নি। তাঁকে ব্যঙ্গ করে রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দবিদায়' প্যারোডি অভিনয়ের ব্যাপার নিয়ে রবীন্দ্রানুরাগীদের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রভক্তদের দ্বন্দ্ব চরমে উঠল। সত্যেন্দ্রনাথও অভিনয় রজনীতে বিশেষ উত্তেজনা প্রকাশ করেছিলেন, এরূপ শোনা যায়।

সাহিত্যিক আসরে নিয়মিত বৈঠকের (বিশেষ রেক 'ভারতী' পত্রিকা অফিসে) তিনি ছিলেন অন্যতম আড্ডাধারী। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এ বিষয়ে ছিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গী। তরুণতর কাব্যরসিকদের কোনো কোনো দলের সঙ্গে তাঁর প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছিল।

রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে গান্ধীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অকুণ্ঠ। গান্ধীজীর প্রতি কটূক্তি করায় তিনি পুরাতন সুহৃদ 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদে পর্যন্ত দ্বিধা করেন নি।

সত্যেন্দ্রনাথেব ভ্রমণের পরিধি সেকালের সাধারণ ভদ্র বাঙালির তুলনায় কিছু অধিক হতে পারে। কাশ্মীর বা দার্জিলিং ছাড়া যুক্তপ্রদেশের এলাহাবাদ, জৌনপুর, অযোধ্যা, ফয়েজাবাদ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে, দিল্লী, পুরী এবং লাহোরে তিনি ভ্রমণব্যপদেশে গিয়েছিলেন। এ তালিকার বিস্তার অবশ্য কোনদিক থেকেই বিস্ময়কর নয়।

কবির মানসভ্রমণের সীমানা তুলনায় অধিক প্রশস্ত। নানাবিধ অসুস্থতা সত্ত্বেও কলকাতা বাসকালে Imperial Library-র তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান পাঠক। নানা ভাষায় লেখা কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহে তাঁর উৎসাহ ছিল। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানানুসন্ধিৎসায় তাঁর চিত্ত ছিল চিরজাগ্রত। সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে যে পুস্তকাবলী দান করেছিলেন তার দিকে তাকালেই সত্যেন্দ্রনাথের অধ্যয়নের বিস্তার অনুধাবন করা যায়। অমলচন্দ্র হোম সত্যেন্দ্র-স্মৃতিতে লিখেছিলেন, "তাঁর ঠাকুরদাদার লাইব্রেরীতে ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন, ভারতবর্ষের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কেতাব সংগ্রহ অনেক ছিল। দর্শনে তাঁর অভিরুচি খুব ছিল না বটে, কিন্তু তাও যে তাঁর পড়া ছিল না, এমন নয়। ইতিহাস—দেশের ও বিদেশের—তাঁর মত পড়া খুব অল্প লোকেরই দেখেছি। তারপরে কাব্য ও সাহিত্যের ত কথা-ই নেই। পুরাণই কি তাঁর কম পড়া ছিল? যখনই কোথাও পৌরাণিক কিছুর উল্লেখ নির্ণয় করতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি, তখনই তা কোথায় আছে বলে দিয়েছেন।" সাধারণ

শিক্ষিত বাঙালির তুলনায় তাঁর ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় বেশি অধিকার ছিল। ফার্সীর জ্ঞান তাঁর শব্দচেতনা বাড়িয়েছে। বিদেশি ভাষার মধ্যে ফরাসীতে বেশ দখল থাকায় য়ুরোপীয় সাহিত্যের সকল মহলে তাঁর প্রবেশ সম্ভব হয়েছিল। সম্ভবত তিনি জর্মন ভাষাও কিছু জানতেন।

১৯২২ সালের ২৫শে জুন মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে কলকাতায় সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

॥ পাঁচ ॥

সত্যেন্দ্রনাথের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর একটি তালিকা [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ধারিত প্রকাশকাল অনুযায়ী] দেওয়া গেল।

এক। সবিতা—১৯০০

দুই। সন্ধিক্ষণ—১৯০৫

তিন। বেণু ও বীণা—১৯০৬ [পরবর্তী কালে 'সন্ধিক্ষণ' এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।]

চার। হোমশিখা—১৯০৭ ['সবিতা'ও এই সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে।]

পাঁচ। তীর্থ-সলিল (অনুবাদ-কাব্য)—১৯০৮

ছয়। তীর্থরেণু (অনুবাদ-কাব্য)—১৯১০

সাত। ফুলের ফসল—১৯১১

আট। কুহু ও কেকা—১৯১২

নয়। তুলির লিখন—১৯১৪

দশ। মণিমঞ্জুষা (অনুবাদ-কাব্য)—১৯১৫

এগারো। অভ্র-আবীর—১৯১৬

বারো। হসন্তিকা—১৯১৭

তেরো। বেলা শেষের গান—১৯২৩

চৌদ্দ। বিদায় আরতি—১৯২৪

এ ছাড়া 'কাব্যসঞ্চয়ন' নামে তাঁর সমগ্র রচনাবলী থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা' নামক অপর একটি সংগ্রহে শিশুদের উপযোগী নির্বাচিত কবিতাবলী স্থান পেয়েছে।

তাঁর অপরাপর রচনার উল্লেখ প্রয়োজনহীন। কবির প্রতিভা ও প্রবণতার উপরে তারা এমন কিছু আলোকপাত করে না। 'বারোয়ারী' নামে উপন্যাসের অংশ বিশেষ নেহাৎই ফরমায়েসী রচনা। নরওয়েজিয়ান উপন্যাসের অনুবাদ 'জন্মদুঃখী' সাহিত্য-পাঠকের কৌতূহলের ফল। প্রকৃত সাহিত্যিক প্রেরণা এদের সৃষ্টির পেছনে সক্রিয় ছিল না। এই কৌতূহল নিয়েই তিনি কিছু বিদেশি নাটকের ভাষান্তরও করেছিলেন।

এই তালিকার দিকে তাকিয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা চলে—

এক। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৬-এর মধ্যে কবির কাব্যরচনাক্ষমতার প্রকৃত প্রকাশ ঘটে। নিয়মিত কাব্যরচনা শুরু হয় তখন থেকেই। মৃত্যুর পুর্ব পর্যন্ত কবির সৃষ্টিধারা অব্যাহত ছিল।

দুই। কবির কাব্যগুলির প্রথম প্রকাশ কাল থেকেই ঐ সব কাব্যের অন্তর্গত কবিতাগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা চলে। ১৯০৫ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত লেখা কবিতাগুলি (অনুবাদ বাদ দিয়ে) 'বেণু ও বীণা'য় এবং ১৯০৬ থেকে ১৯০৭

পর্যন্ত লেখা কবিতাগুলি (এ ক্ষেত্রেও অনুবাদ বাদ দিয়ে) 'হোমশিখা'য় স্থান পেয়েছে। ১৯১০ পর্যন্ত যত অনুবাদ কবিতা তিনি লিখেছিলেন তারা সংকলিত হয়েছে 'তীর্থ-সলিল' ও 'তীর্থরেণু'তে। প্রথমোক্ত কাব্যের অনুবাদ কবিতাগুলি ১৯০৮ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে রচিত হলেও পূর্ববর্তী দু-একটি অনুবাদ যে এর অন্তর্ভুক্ত হয় নি এমন কথা জোর করে বলা যায় না। ১৯০৭ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত রচিত মৌলিক কবিতাগুলির মধ্যে ফুল বা ঋতু-বিষয়ক রচনা এবং গান গ্রথিত হয়েছে 'ফুলের ফসল' কাব্যে। কিন্তু ১৯০৭ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত রাজনীতি-সমাজনীতি-দেশপ্রেমমূলক বা অন্য নানা প্রসঙ্গে যে সব কবিতা তিনি লিখেছেন, তারা স্থান পেয়েছে 'কুহু ও কেকা'য়। তার মধ্যে অবশ্য ফুল ও ঋতু বিষয়ক কিছু রচনাও স্থান পেয়েছে। 'তুলির লিখন'-এর মৌলিক কবিতাগুলি ১৯১২ থেকে ১৯১৪-এর মধ্যে রচিত। ১৯১০ থেকে ১৯১৫-এর মধ্যে যে অনুবাদগুলি তিনি করেছিলেন তাদের গ্রন্থবদ্ধ করা হল 'মণিমঞ্জুষা' নামে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে লেখা সর্ববিধ (হাস্যরসাত্মক বাদে) মৌলিক কবিতায় অঞ্জলি ভরা হয়েছে 'অভ্র-আবীর'-এ। ১৯১৩ থেকে ১৯১৭-এর মধ্যে রচিত ব্যঙ্গ কবিতাগুলি 'হসন্তিকা' বইয়ে স্থান পেয়েছে। ১৯১৬ থেকে যে সব মৌলিক কবিতা এবং ১৯১৭ যে সব ব্যঙ্গ কবিতা তিনি লিখেছিলেন তা 'বেলা শেষের গান' এবং 'বিদায় আরতি' নামে দুটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে কবির মৃত্যুর পরে।

তিন। কবির রচনাবলীর মধ্যে কালগত বিবর্তনধর্মের কোন পরিচয় নেই। কোনো কোনো সমালোচক তাঁর কাব্য প্রবাহকে উদ্ভব-পর্ব (১৮৯৩?-১৯০০), বিকাশ-পর্ব (১৯০০-১০) এবং সমৃদ্ধি-পর্ব (১৯১১-২২) তিনটি ক্রমবিকাশমান স্তরে বিভক্ত করে দেখাতে চেয়েছেন।

এরূপ স্তরভেদ প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না। ১৯০৫ সালের পূর্বে নিয়মিত কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রবেশ করেন নি, এ পর্যন্ত চলেছে নেহাৎই পরীক্ষা-নিরীক্ষা—হাত পাকানোর পালা। তখন কবির বয়স তেইশ বছর। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত-ভাবে কাব্যরচনা করেছেন। এই আঠারো বছর কাল কবির জ্ঞানচর্চার বিরাম ছিল না। শব্দ ও ছন্দবোধ নিঃসংশয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জ্ঞানের পরিধি বাড়ছিল। রাজনৈতিক চেতনা স্পষ্টতর হচ্ছিল। এই পরিবর্তনের প্রতিফলন তাঁর কবিতায় পড়তে বাধ্য। কার্যত এই আঠারো বছরে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় গুরু পরচনায় কোন বাঁক ফেরার চিহ্ন নেই। কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন নেই, কোনো বিশিষ্ট বিবর্তনধর্ম অনুসৃত হয় নি। বয়সোচিত পরিপক্কতা আসতে কিছু সময় কেটেছে। তীর্থসলিল ও তীর্থরেণু এ পরিণতি-বিধানে কবিকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। বহুসংখ্যক বিদেশি কবির রচনার নৈকট্য কবির রচনাভঙ্গিতে কোন নিজস্ব স্টাইলকে সম্ভাবিত না করলেও পারিপাট্য এনেছে, মানোন্নয়নে নিশ্চিত সহায়তা করেছে। ১৯০৯-১০ সালের রচনায় যে মার্জিত নৈপুণ্য এসেছে বা ভাবানুভূতিতে যে সব বিশিষ্টতা চোখে পড়েছে তার চেয়ে অধিকতর বিকাশ সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় পরবর্তীকালে আসে নি। যে-কোনো কবির রচনায় দুটি স্তর দেখা যায়, একটি অপরিণতির, অপরটি পরিণতকালের। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার অন্যবিধ স্তরভেদের কল্পনা অপ্রয়োজনীয়।

॥ ছয় ॥

সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের এবং সমকালীন যুগজীবনের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা গ্রহণ করেছি তার মধ্য থেকে কবির

অন্তর্জীবনের কোন বিশিষ্ট মূর্তি কল্পনা করা যায় কিনা তাই-ই দেখব। কবির কাব্যদৃষ্টিতে এই অন্তর্জীবনের স্বরূপ পরিচয়ের গুরুত্ব আছে। একই যুগে বাস করে বিভিন্ন ব্যক্তির কবিস্বভাবে স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে। কবির ব্যক্তিগত জীবনচর্যা কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে তাঁর অন্তর্জীবনের প্রত্যক্ষ নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়, আবার কোনো কবির ক্ষেত্রে এদের মধ্যে সম্পর্কনির্ণয় কিছু দুরূহ বলে মনে হয়। কিন্তু যে-কোনো অবস্থায় কবির ব্যক্তিজীবন ও কবি-জীবনের মধ্যে কিছু সম্বন্ধ থাকবেই—এ প্রত্যয়ে সন্দেহ নেই।

সত্যেন্দ্রনাথ যে যুগে বেঁচে থেকে কাব্যরচনা করেছিলেন, ভারতের ইতিহাসে তাকে ঝড়ের যুগ বলা যেতে পারে। য়ুরোপের ইতিহাসেও এ-এক যুগসন্ধির কাল। ভারতে তখন যে প্রবল তরঙ্গ-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল ভবিষ্যতের আলোর দিকে তার মুখ ফেরানো ছিল; য়ুরোপে এই যুগসন্ধির আঙ্গুল কিন্তু নির্দেশ করছিল সংশয়-নৈরাশ্যের অন্ধকারকে। য়ুরোপীয় মননে বিংশ শতকীয় যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল এই যুগে, বাংলার চিন্তাজগতে ১৯৩০ নাগাদ তার আবির্ভাব ঘটেছে। সত্যেন্দ্রনাথ সে মননের অংশীদার নন। য়ুরোপীয় ধনবাদী যন্ত্র-ভিত্তিক সভ্যতার যে বিনষ্টি য়ুরোপীয় চিন্তাজগতে নব দিগন্ত খুলে দিল, ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের ধারণায় তাই-ই যেন অনিবার্য ছিল। এ দৃষ্টির অধিকারী অংশত সত্যেন্দ্রনাথও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কথিত শান্তি এবং যন্ত্রের ঊর্ধ্বে প্রাণের অধিকারের ঘোষণা—"ছিন্নমস্তা ইউরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত পারা"—বিধ্বস্ত য়ুরোপে শান্তি আসুক, হিংসা নত হোক অহিংসার কাছে, প্রীতিমন্ত্রের বিজয় পতাকা উড্ডীন হোক সর্বদিকে—এরূপ কামনা সত্যেন্দ্রনাথের ছিল

বিংশ শতকের য়ুরোপ সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তি-চেতনায় সূক্ষ্মতর কোনো জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে নি।

তরুণ এবং প্রৌঢ় সত্যেন্দ্রনাথের সমকালে ভারতে যে যুগ চলছিল তার পটভূমিতে কবির জীবনের দিকে তাকালে কয়েকটি বিশিষ্টতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এক। রাষ্ট্রনৈতিক ঝড়ের সংক্ষুব্ধতা সত্যেন্দ্রনাথের জীবনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে নি। ১৯০৫ সালে কবির বয়স তেইশ, অসহযোগের যুগে তাঁর বয়স সাঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ। এই কালটা তিনি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বাস করেছেন। অথচ এই আন্দোলনগুলির সঙ্গে তাঁর কর্মজীবনে কতটুকু যোগই বা স্থাপিত হয়েছিল ?

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের কথা এসে পড়ে। রাজনীতিবিদ্ তিনি ছিলেন না। দেশের প্রাত্যহিক রাজনৈতিক কর্ম, এবং কংগ্রেস অথবা অন্য কোনো রাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ১৯০৫ সালের বিস্ফোরণ তাঁকে ব্যাকুল করেছিল। "বাঙ্গালার জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে একই ধ্বনি, একই প্রতিধ্বনি—বাঙ্গলাকে খণ্ডিত হইতে দিবে না। কবি, সেদিন প্রবন্ধ পাঠে, বক্তৃতায়, গানে গানে একেবারে যেন পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রায় প্রত্যহই গান লিখিতেন এবং সেই গান—সেই সোনার বাঙলা, আজ বাঙলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী; ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে, ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে; একলা চল, একলা চলরে; বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার ফুল, বাংলার ফল; আমরা পথে পথে যাব সারে সারে, আমরা গান গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে—প্রভৃতি

গান পথে পথে ঘরে ঘরে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইত।" (রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য—যতীন্দ্রমোহন বাগচী)। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের চারণ গান রচয়িতায় পরিণত হলেন রবীন্দ্রনাথের মত সৌন্দর্যপ্রেমিক অতীন্দ্রিয় রসপিয়াসী কবি। তা ছাড়া রাখি উৎসব, শিবাজী উৎসবের প্রত্যক্ষ কর্মযজ্ঞে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সত্যেন্দ্রনাথের মনোভাব এ আন্দোলনের অনুকূল ছিল। 'সন্ধিক্ষণ' নামক দীর্ঘ কবিতায় তাঁর চিত্তোত্তাপের স্পর্শ আছে। কিন্তু এ-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর জীবনের অন্য যোগ নেই—কর্মী হিসেবে নয়, সাংবাদিক হিসেবেও নয়।

১৯১৯-২২-এর অসহযোগ-আইন অমান্যের প্রবলতর বন্যায় তিনি দর্শক মাত্র, কর্মী নন। গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি, অসহযোগের সাময়িক পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন ছিল না রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরতায় নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গান্ধীজীর প্রতি সুপ্রচুর শ্রদ্ধা (গান্ধীজী, চরকার গান প্রভৃতি কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে) সত্ত্বেও এই আন্দোলনও সত্যেন্দ্রনাথকে কর্মচক্রে আবর্তিত করতে পারে নি।

আমি এমন দাবি করছি না যে বিপ্লবের যুগের প্রতিটি সাহিত্যিকই বৈপ্লবিক কর্মপন্থায় অংশ নেবেন। সত্যেন্দ্রনাথও আরও বহু কবি-শিল্পী বা বিশিষ্ট ব্যক্তির মত এ আন্দোলনের অংশীদার নন। কিন্তু তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয় হল স্বাধীনতাবোধ। তাঁর কবিতাপাঠে মনে হয় ১৯২০-২২ সাল পর্যন্ত এ দেশবাসীর পক্ষে যতটা সম্ভব রাজনৈতিক সচেতনতা তাঁর ছিল। দু'দুটো বড় আন্দোলন তাঁর জীবৎকালে ঘটেছে। সেই দুটি আন্দোলন বা নানা সাময়িক উত্তেজনাকর ঘটনা নিয়ে সুপ্রচুর কবিতা লেখার উৎসাহ তিনি পেয়েছেন, অদ্ভুত

করেন নি সেই আন্দোলনে যোগদান করবার কিছুমাত্র আকর্ষণ। অথচ প্রায়-সমকালীন কবি কুমুদরঞ্জনের ব্যক্তিত্বও তাঁর নয়। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় অতীতের ধর্মীয় গৌরবকথা প্রশ্রয় পেয়েছে, বর্তমানের রাজনীতির স্থান একান্ত সঙ্কীর্ণ। বর্তমান যুগের সর্ববিধ ভাবতরঙ্গ থেকে তিনি দেহে মনে দূরে থাকতে চেয়েছেন। গ্রামবাংলার প্রকৃতির শান্তরসে তিনি আশ্রয় কামনা করেছেন। নাগরিক সত্যেন্দ্রনাথের কোনোরূপ ভাবালু প্রকৃতিদুর্বলতা বা পল্লীপ্রীতি ছিল না। সচেতনতায় ছিল প্রাখর্য, রাজনীতি-বিষয়ের প্রতি ছিল ভালবাসা। তবুও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সরিক তিনি নন। আবার অনুজ কবি নজরুলের সঙ্গেও সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিপ্রবণতার গভীর পার্থক্য লক্ষণীয়। অসহযোগ আন্দোলনের বছরগুলিতে শুধুমাত্র কবিতার মাধ্যমে সমর্থনজ্ঞাপনে নয়, প্রত্যক্ষভাবে সংগঠনের কাজেও আত্মনিয়োগ তিনি করেছিলেন, সাংবাদিক হিসেবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে কারাবরণ পর্যন্ত তিনি করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহের পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছেন, ভেসে যান নি সে স্রোতে। নজরুলের রাজনৈতিক কবিতায় এই প্রবাহের গতির অনুভূতি জড়িয়ে আছে, সত্যেন্দ্রনাথে তা দর্শকের মননকে ছাপিয়ে যায় নি।

দুই। ব্যক্তিগতভাবেও সত্যেন্দ্রনাথের জীবনচর্যা ছিল নিস্তরঙ্গ। সম্পন্ন ভদ্র গৃহস্থের মসৃণ জীবনের পথ ধরে দৈনন্দিনতার বাঁধা খাতে তিনি চলেছেন। সে জীবনে 'কল্লোল'-এর বহু কবির ধার করা বোহেমিয়ানিজম্ নেই, নজরুলের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বর্ণবহুল প্রগল্‌ভতা নেই। ভাগ্যের তাড়নায় বহু পন্থা পরিক্রমা করতে হয় নি তাঁকে। এমন কি জীবিকা অর্জনের তাগিদেও কর্মচঞ্চলতা তাঁকে অনুভব করতে হয় নি। ছাত্রজীবনের সমাপ্তিতে মামার

ব্যবসায়ে কিছুকালের জন্য যোগ তিনি দিয়েছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তা ছেড়ে দিয়ে পূর্বপুরুষদের অর্জিত অর্থে জীবন কাটিয়েছেন। দারিদ্র্যের জ্বালা নেই তাঁর জীবনে, বিলাসীর ভোগাতিরেক নেই। এই কারণেই কি তাঁর কবিতায় উপলব্ধির তীব্রতার এত অভাব? দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতিতে দূরত্ব আছে, নজরুলসুলভ একাত্মতা নেই। ঘটনাবিরল জীবন সত্যেন্দ্রনাথের। তাই কি কবিতায় তথ্যের সুপ্রচুর আয়োজনে মানসিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা?

তিন। জ্ঞানচর্চা সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কিন্তু অমলচন্দ্র হোমের সাক্ষ্য অনুসরণ করে বলা যায়, দর্শনে তাঁর বিশেষ অভিরুচি ছিল না। বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। মানববিদ্যার যে মহলকে আমরা সোশ্যাল কনশ্যাসনেস বলি সত্যেন্দ্রনাথের মনন তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। কিন্তু যে কস্‌মিক কনশ্যাসনেস থেকে বিশ্বরহস্য বোধের জন্ম কবির জ্ঞানসাধনা তা থেকে দূরবর্তী ছিল। রোমান্টিক রহস্য, অস্পষ্ট অরূপানুভূতি ও অসীমাকুতির প্রতি তাঁর সর্বব্যাপী বিকর্ষণ, স্পষ্ট প্রত্যক্ষের কাছে তাঁর কবিসত্তার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের উৎসেই এই মনোভাবের জন্ম।

চার। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষাচর্চাকে কোন বিশিষ্ট সমালোচক মধুসূদনের সমধর্মী বলে বর্ণনা করেছেন। এই তুলনায় সত্যতা নেই। দেশি-বিদেশি বারো তেরটি ভাষার উৎসবে মত্ত সিংহ-প্রাণ মধুসূদনের কিছুমাত্র নৈকট্য সত্যেন্দ্রনাথ দাবি করতে পারেন না। সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা যে তিনটি ভাষায় শিক্ষিত বাঙালি মাত্রের অধিকার তার উপরে মাত্র দুটি ভাষা তাঁর জানা ছিল— ফার্সী এবং ফরাসী। বহু ভাষা থেকে কবিতা অনুবাদের মধ্যে কবি দৈনন্দিন মামুলি জীবন থেকে মনের মুক্তি খুঁজেছিলেন ব্যাপক

বিশ্বসাহিত্য-সংসারে মাত্র দুটি বিদেশি ভাষার পুঁজি নিয়ে—সেখানে এত বড় সিদ্ধান্ত করা চলে না।

পাঁচ। আসলে কসমিক্ কনশ্যাসনেসের সূত্র ধরেই হোক বা বহু ভাষা সাহিত্যের চর্চার পথ দিয়েই হোক কোনোরূপ মানসমুক্তির কামনা তাঁর ছিল না। কামনার কোন কাম্যরাজ্যের জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন না। কর্মচাঞ্চল্য যেমন ছিল না তাঁর জীবনে, তেমনি অন্তর-ব্যাকুলতাব দ্বাবা প্রতিনিয়ত আর্তও তিনি হয়ে ওঠেন নি। মোটামুটি নিশ্চিন্তপ্রাণ মানুষ হিসেবে তাঁকে চিনে নেওয়া কঠিন নয়, ঘটনাবিবল জীবনেব প্রাপ্ত তথ্যাদিব মাধ্যমে।

ছয়। সত্যেন্দ্রনাথ জীবনে কি পলায়নবাদী ছিলেন? সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত থেকে দূবে অবস্থান কবে ছন্দের বিচিত্র খেলায় মুগ্ধ হওয়া, লঘু তরল খেয়ালী কল্পনাব বাজ্যে বার বাব উড়ে যাওয়া যেন সেই দিকেই ইঙ্গিত কবে। কিন্তু একথাও ভোলা চলে না, সত্যেন্দ্রনাথ অজস্র কবিতায় সমকালীন রাজনীতির চাঞ্চল্যকে বিষয়রূপে আমন্ত্রণ কবেছেন। অথচ নজরুল ইস্‌লাম রাজনীতির বৈপ্লবিক উপলব্ধি এবং প্রেম ও নিসর্গেব সৌন্দর্যানুভূতিব মধ্যে প্রতিনিয়ত দ্বিধায় দুলে আর্ত হয়ে উঠেছেন, সত্যেন্দ্রনাথে তেমনি কোন অন্তর্দ্বন্দ্বেব পবিচয় মেলে না। বিপরীত কোটির চেতনা শিল্পীচিত্তেব গভীবতম প্রদেশকে কর্ষণ করলেই মাত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের রাজনীতি-চেতনাব পরিচ্ছন্নতা ব্যক্তিজীবনের বাহির মহল অতিক্রম করে কবির অন্তর্জীবনের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারে নি; আবার তাঁর ছন্দ-খেলা বা খেয়ালী কল্পনাও শিল্পীচেতনাকে ছুঁয়ে গেছে মাত্র, গভীরতর স্তরকে বিদ্ধ করে নি।

সাত। পুর্বোক্ত লক্ষণগুলি দেখে মনে হয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের কেন্দ্রটি দুর্নিরীক্ষপ্রায়। বাহির মহলের নানা আকর্ষণ অনুভব করেছেন তিনি, কিন্তু তাঁর নিস্তরঙ্গ ভদ্রজীবনে বিশেষ কোনো চাঞ্চল্য দেখা দেয় নি। যুগজীবন তাঁর অন্তরপুরুষকে যৌবনের কাঠিন্য দিয়েছিল মাত্র এরূপ মনে করবার কারণ আছে। যদি কোথাও তাঁর অন্তর্জীবনের কেন্দ্র থাকে তবে তা এখানে—চাঞ্চল্যহীন ভদ্র মসৃণ জীবনে যুগঝঞ্ঝা থেকে তিনি কথঞ্চিৎ মৌন কঠিন যৌবনশক্তি সঞ্চয় করেছিলেন।

॥ সাত ॥

সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন কবিদের মাঝখানে তাঁর অবস্থানের বিশিষ্টতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। এই পর্যবেক্ষণ তাঁর ব্যক্তিপ্রবণতাকে চিনে নেবার ভূমিকা রচনা করতে পারে। তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে নামোল্লেখ করতে হয় প্রমথ চৌধুরী (জন্ম ১৮৬৮), করুণানিধান (১৮৭৭), যতীন্দ্রমোহন (১৮৭৮), কুমুদরঞ্জন (১৮৮৩), যতীন্দ্রনাথ (১৮৮৭), মোহিতলাল (১৮৮৮) কালিদাস রায় (১৮৮৯) এবং নজরুল ইসলামের (১৮৯৯)।

প্রমথ চৌধুরী বয়সে অন্যদের অনেক বড় এবং নজরুল অনেক ছোট। বয়সের দিক থেকে নজরুল সাম্প্রতিক কবি-গোষ্ঠির সমকালীন। কিন্তু উপরোক্ত কবিদের প্রতিনিধিমূলক অনেকগুলি কাব্য একই কালে প্রকাশিত হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলির ('সবিতা' বাদে) প্রকাশ ও রচনা কাল ১৯০৫ থেকে ১৯২২-এর মধ্যে। প্রমথ চৌধুরীর দুটি মাত্র কাব্য 'সনেট পঞ্চাশৎ'

ও 'পদচারণা' প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ১৯১৩ ও ১৯১৯ সালে। ১৯০৫ থেকে ২২-এর মধ্যে অন্যান্য কবিদের নিম্নলিখিত কাব্যগুলি রচিত এবং প্রকাশিত হয় :—করুণানিধানের 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদূর্বা'; যতীন্দ্রমোহনের 'লেখা', 'রেখা', 'অপরাজিতা', 'নাগকেশর', 'জাগরণী'; কুমুদরঞ্জনের 'শতদল', 'বনতুলসী', 'উজানী', 'একতারা', 'বীথি', 'বীণা', 'বনমল্লিকা', 'নূপুর'; মোহিতলালের 'স্বপনপসারী'; কালিদাস রায়ের 'কুন্দ', 'কিশলয়', 'পর্ণপুট', বল্লরী,' 'ব্রজরেণু', 'ঋতুমঙ্গল,' 'ক্ষুদকুঁড়া' এবং নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা'। এ ছাড়া যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা' ও নজরুলের 'দোলন চাঁপা'র বেশীর ভাগ কবিতা, মোহিতলালের 'বিস্মরণী'র কতকগুলি কবিতা নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে রচিত হয়েছিল। এঁদের কবিপ্রকৃতির তুলনামূলক ইঙ্গিত সত্যেন্দ্রনাথকে বুঝবার পক্ষে সহায়ক হবে।

করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়ের মধ্যে কবিপ্রকৃতিগত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকায় এঁরা 'কবি-চতুষ্টয়' নামে পরিচিত হয়েছেন। এঁদের কবিতার সাধারণ ধর্ম্ম বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার' গ্রন্থে পূর্বে যা বলেছি প্রাসঙ্গিক বোধে তার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত হল, "বৈষ্ণব-ভাবনা, প্রেম-চেতনার বিশুদ্ধি এবং প্রকৃতিপ্রীতির অতিরেক, সত্য-শিব-সুন্দরে অচল বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা-বর্ষণের মধ্য দিয়েই এঁদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবভাবনায় সুগভীর মৌলিকতা ছিল। তার লীলারস সৌন্দর্যের আস্বাদে যেমন তিনি ছিলেন ব্যাকুল তেমনি তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মানবরসের অনুসন্ধানেও তাঁর ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু আলোচ্য

কবি-চতুষ্টয় বৈষ্ণব-প্রেমের মাধুর্যের তুলনায় হরিভক্তিরসে চিত্তকে সরস করে নিতেই চেয়েছেন। প্রেম-কল্পনায় এঁদের মধ্যেও একটা দেহাতীত বিশুদ্ধির সুর অতি স্পষ্ট। রবীন্দ্রকল্পনার প্রেমতত্ত্বের উপলব্ধি এঁদের মধ্যে না মিললেও বিহারীলাল থেকে শুরু করে প্রেম যেভাবে দেহভাবনা মুক্ত হতে থাকে এবং রবীন্দ্রনাথে যে ভাবে তা নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা পায়, তাকে এঁরা প্রেম-বোধের চরম বলে সংশয়াতীত ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতি-চেতনার ক্ষেত্রেও তাঁরা যে ধারার অনুকারী তার সূত্রপাত বিহারী-লাল থেকে। রবীন্দ্রনাথে তা জীবনজিজ্ঞাসার মূলের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আশ্চর্য গভীরতা পায়। সে গভীরতা ও অনিবার্যতায় এঁরা কোনকালে পৌছতে না পারলেও, রবীন্দ্রকাব্যের কাছ থেকে একটা শিক্ষা লাভ করেছিলেন—নগরসভ্যতার কোলাহল থেকে দূর প্রকৃতির শান্ত-কোমল রূপের সাধনাই কবিধর্ম। ফলে এ সাধনায় সর্বদাই চিত্ত উদ্বেলিত ও একাগ্র ছিল এমন মনে হয় না, কোথাও এই পল্লী-প্রকৃতির প্রতি ভালবাসায় 'ফ্যাসন-এর ঝোঁক আসে নি একথা জোর করে বলতে পারি না। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ভাষা, চিত্রকল্প, উপমা ও রূপরচনারীতি, কবিতার দেহগঠনপদ্ধতি ও ছন্দকলা এঁদের প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল বলা চলে।"

এঁদের চারজনের মধ্যে কোনোরূপ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না এমন অবশ্য নয়। ক্ষুদ্র বস্তু, শান্ত রস, স্তিমিত জীবনাবেগ, ছোট প্রাণ ছোট কথা, প্রকৃতির সরল সরস নিস্তরঙ্গ সমতাল সমকালের বেদনাদীর্ণ পৃথিবী থেকে কুমুদরঞ্জনকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, আবার কালিদাস রায়ে প্রিয় পুরাতনের দিকে তাকিয়ে ব্যথাহত চিত্তের দীর্ঘশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। অতীতের প্রতি তাঁর ভালবাসা, কিন্তু রুদ্র বর্তমানের অনিবার্য সংঘাতে তার নিত্যক্ষীয়মানতা

কবি অনুভব করেছেন। যতীন্দ্রমোহনের বিশিষ্টতা শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষের সহজ জীবনরস-প্রীতিতে, এবং ক্বচিৎ পুরাণ রাজ্যে পরিক্রমায়, কিঞ্চিৎ নাটকীয় রসসৃষ্টিতে। অপরপক্ষে করুণানিধানের দৃষ্টিতে আছে মদির সৌন্দর্যবিহ্বলতা এবং তার সঙ্গে বিজড়িত এক বিচিত্র অস্থৈর্য। তাঁর প্রেম-কবিতায় এবং নিসর্গ-কবিতায় এ-সুর সমানভাবে বেজেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রভক্ত কবি হলেও এঁদের সঙ্গে তাঁর মানস-সামীপ্য নেই। তাঁর কবিপ্রকৃতিতে গ্রামবাংলার প্রতি নেই কোন বিশিষ্ট আকর্ষণ, বৈষ্ণব ভাবালুতা তাঁকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে নি। কুমুদরঞ্জনের মত শান্ত পল্লীর ক্ষুদ্র বস্তুনির্যাসের প্রতি ছিল না সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ কোন প্রবণতা। কালিদাস রায়ের ন্যায় অতীত ও বর্তমানের সংঘাতের বেদনা তিনি উপলব্ধি করেন নি, অথচ অতীতকালের প্রতি তাঁর সুগভীর প্রীতির পরিচয় আছে তাঁর অজস্র কবিতায় এবং বর্তমান কালের নব্য পরিবর্তিত আদর্শ সম্বন্ধে তিনি অচেতন নন। যতীন্দ্রমোহনের নাট্যরস সম্ভোগে তাঁর রুচি ছিল না, কিন্তু পুরাণ-রাজ্যে পরিক্রমায় আনন্দ তিনি পেতেন; মানবিক মূল্যে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু বিশেষ করে গ্রামীণ সারল্যের জন্য সহানুভূতির পাল্লা কখনও ভারী হয়ে ওঠে নি। করুণানিধানের রূপবিহ্বলতা ও অতৃপ্তি সত্যেন্দ্রনাথের নয়, যদিও বহির্বঙ্গে ভ্রমণ তাঁর কবিতার প্রেরণা যুগিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রপ্রভাবের যুগেই কবিতায় রোমান্টিকতা-বিরোধী, তির্যক ব্যঙ্গদৃষ্টিবিদ্ধ, বুদ্ধিশানিত ও মার্জিত নাগর বৈদগ্ধ্যযুক্ত যে রসের আয়োজন করলেন তা থেকে সাধারণভাবে সত্যেন্দ্রনাথের দূরত্ব অনেক। সত্যেন্দ্রনাথের জীবন-দৃষ্টির ও

ভাষা-ভঙ্গির এমন তীক্ষ্ণ একাগ্রতা ছিল না, অধ্যয়নের প্রাচুর্য থাকলেও মননের ছিল না এমন অন্তর্ভেদী তীব্র বিচ্ছুরণ। তবে ব্যঙ্গ কবিতায় বীরবলের প্রভাব তাঁর উপরে কিছু পড়ে থাকবে। কিন্তু সাধারণ ভাবে কবিতার দেহপারিপাট্যে ও প্রসাধনে সত্যেন্দ্রনাথ যে সচেতনতা দেখিয়েছেন 'রূপায়নবাদী' প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তার সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়। কল্পনার অতিরেক এবং রহস্যবিজড়িত সুদূরতার প্রতি উভয়ের বিরূপতাই স্পষ্ট, তার উৎস কি ফরাসী কাব্যের প্রভাবে?

যতীন্দ্রনাথের বুদ্ধিপ্রবুদ্ধ নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যবাদ, জড়ধর্মী দুঃখবাদী চেতনা, গাম্ভীর্যে-বিদ্রূপে মিশ্রিত বিচিত্র ভাষারীতির সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের আশাবাদী, প্রফুল্ল, তারুণ্য উদ্ভাসিত চিত্তের নৈকট্য বড় বেশি নেই। তবে রোমান্টিক সুদূরাভিসারের স্থানে প্রত্যক্ষ বাস্তবের অঙ্গীকারে এবং পৌরুষের দ্বারা রহস্যময় ভাবব্যাকুলতাকে প্রতিহত করায় উভয়ের কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

মোহিতলালের বিশিষ্ট নারী-চেতনা ও প্রেমবোধ এবং বীরাচারী তান্ত্রিক-সুলভ দেহচিন্তা রবীন্দ্রভাববৃত্তে বিপরীত ধারার দ্বার খুলে দিল। সত্যেন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতা বড় নেই। মোহিতলালের ন্যায় সুগভীর দার্শনিকসুলভ ভাবকল্পনার অধিকারীও সত্যেন্দ্রনাথ নন। তবে, রচনাভঙ্গির নিষ্ঠাপূর্ণ পরিমার্জনা, তথা ক্লাসিক সংহত রূপনির্মিতি মোহিতলালের সঙ্গে তাঁকে সালোক্য দিয়েছে।

নজরুল ইসলামের কবিতার দুই ধারা। একদিকে রাজনীতি-মূলক কবিতায় গভীর আবেগপ্রাণতা ও সুতীব্র সাম্যভাবনা অন্য দিকে মদির দেহভাবনাময় প্রেম ও নিসর্গসম্ভোগ। সত্যেন্দ্রনাথে রাজনীতি-বিষয়ক কবিতার প্রাচুর্য থাকলেও নজরুলের আবেগ প্রবলতা তাঁর নেই, তিনি স্রোতাপন্ন নন, পথপার্শ্বের দর্শক॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শক্তিধর কঠিন যৌবন

চির যুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুলমাল্যগাছা।

—রবীন্দ্রনাথ : বলাকা

॥ এক ॥

কোনো কবির কবিচিত্তের ভারকেন্দ্রটির পরিচয় নেওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই পরিচয় কবিচিত্তের অবগুণ্ঠিত রহস্য-উদ্ধারেই মাত্র পাঠককে সাহায্য করে না, কবির কাব্যসাফল্যের কুঞ্চিকারও অধিকার দেয়। তবে এ বিষয়ে সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কবিচিত্তের ভারকেন্দ্রটি খুব যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করে কাব্যমূল্য নির্ধারণ করতে গেলে পূর্ণ সাফল্য অর্জিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। এই কেন্দ্রটিকে অস্বীকার করে কাব্যবিচার —বিচ্ছিন্ন কবিতার খণ্ড খণ্ড বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা—কবির সামগ্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারে না। অবশ্য মহৎ কবিদের ক্ষেত্রে চিত্তভিত্তিটি একান্ত জটিল ও গভীর হয়। বহু বিচিত্র পথে পরিক্রমা, সপ্ত সাগরের মাধুকরীও তাঁকে নিজ বৃত্ত থেকে বিচ্যুত করে না। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতার কথা স্মরণ করা

যেতে পারে। আপন কবিচিত্তের কেন্দ্র এবং বিশ্ব-বৈচিত্র্যে সঞ্চরমান পরিধির সম্বন্ধ-রহস্যটি কবি এখানে ব্যক্ত করেছেন—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

আবার, তিনিই—

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবিদের এই চিত্ত-কেন্দ্রটিও শুধু জটিল এবং গভীরই নয়, ভাব, বস্তু ও রূপকে আয়ত্ত করার যাদু-ক্ষমতাও তাঁর আয়ত্তে। সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একদা রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিআত্মার এই বিশিষ্ট ক্ষমতার কথাই বলেছিলেন। কবির মতে বাহিরের জগৎ কবির মনের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর মনের জগতে রূপান্তরিত হয়। বিচিত্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেই; যন্ত্রের মত তাঁর কবিহৃদয় জড় অনমনীয় নয়, আবার তা জলের মত আকার-প্রকারহীন, বিশিষ্টতাবর্জিতও নয়। বিষয়ের পাত্রে তা বহুরূপী হয়ে ওঠে না। মধুসূদন এক চিঠিতে গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন যে একটি টুপি বা টাই অন্যের কাছ থেকে নিয়ে তিনি পরতে রাজি আছেন, কিন্তু গোটা স্যুটটা তিনি ধার করতে আদৌ প্রস্তুত নন। নিজের বিশিষ্ট ভাবানুভূতি ও রূপ-চেতনার রাজ্যে সব সাহিত্যিকই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তবে এই রাজ্যটি কারও কারও ক্ষেত্রে বহুল বিস্তৃত, অপরের ক্ষেত্রে একান্ত সংকীর্ণ। আবার কবি নিজের চিত্তকেন্দ্র বিষয়ে সবক্ষেত্রে সচেতন নাও হতে পারেন। অথবা নানাবিধ বাহির মহলের আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ করে বার বার এই কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যেতে পারেন। তবে যে-ক্ষেত্রে

এই কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত সেখানে উক্ত লেখককে কবি না বলে পদ্য-রচয়িতা বলাই শ্রেয়—দুই চারিটি ভাল কবিতা তাঁর কলম থেকে বেরুলেও।

কিন্তু এই কেন্দ্রবিন্দুটি আবিষ্কারের উপায় কি? পদ্ধতিটি কিছু জটিল, এবং কবিভেদে এর মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানোও সঙ্গত। প্রথমত, কবিতার পরিমাণ সমালোচককে বিভ্রান্ত করতে পারে। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বকে কাব্যবিচারে চরম মূল্য দেওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, রূপরচনা অর্থাৎ কাব্যিক সাফল্যকে অস্বীকার করে এজাতীয় কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান চলে না। কবির সমগ্র চিত্ত কোথায় উদ্বুদ্ধ হল তা উপলব্ধি করা দরকার। যে-বিষয়ে বহু কবিতা তিনি লিখেছেন সেখানে তাঁর কবিচিত্তের যথার্থ স্ফুরণ নাও ঘটতে পারে, অন্য নানাবিধ কারণে বহিরাগত নানা সাময়িক প্রেরণায় হয়তো তিনি সাড়া দিয়েছেন।

এই কথাগুলি মনে রেখে অগ্রসর হলে বাঞ্ছিত ফল লাভ হতে পারে। আসলে কবির চিত্তকেন্দ্রের বিচারও যে সাহিত্য-সমালোচনা, এ বোধটি জাগ্রত রাখা প্রয়োজন।

॥ দুই ॥

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়-পরিচিতি তাঁর কবিপ্রাণের কেন্দ্রটিকে ধরবার ব্যাপারে পাঠককে প্রত্যক্ষত সাহায্য করে না। তবে তার পরোক্ষ সাক্ষ্যের কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে। কবি খুব বেশি করে যেসব বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতেন তা বিবৃত হল।

এক। স্বাজাত্যাভিমানমূলক ভাব, ঘটনা, ব্যক্তি প্রভৃতি নিয়ে লেখা কবিতার সংখ্যা অনেক। এদের মধ্যে কতকগুলি কবিতায় সাধারণভাবে দেশের ভৌগোলিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক তথা

পৌরাণিক ঐতিহ্যের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে; অনেকগুলি কবিতায় মনীষীদের কীর্তি-ঘোষণার মধ্যে জাতির অতীত গৌরব-কথা এবং বর্তমানের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং জাগতিক নানা সমস্যা এবং সমাধানের বিবিধ ইঙ্গিত তাঁর কবিতার একটি বিস্তৃত অংশ অধিকার করে বসেছে।

দুই। নানা বিষয়কে অবলম্বন করে লেখা লঘু তরল খেয়ালী কল্পনামূলক অনেক কবিতা তিনি লিখেছেন। এজাতীয় কবিতা রচনায় সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রবণতা ছিল বলা যায়।

তিন। (প্রকৃতিবিষয়ক কবিতারচনায়ও সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহের অভাব ছিল না। ঋতু পর্যায়েব মধ্যে সর্বাধিক কবিতা বর্ষাবিষয়ক। ফুল সম্বন্ধেও অনেকগুলি কবিতা তিনি লিখেছিলেন। সমুদ্র, পর্বত, নদীও বহুক্ষেত্রে তাঁর প্রকৃতি-কবিতাব বিষয় যুগিয়েছে।)

চাব। সত্যেন্দ্রনাথেব ব্যঙ্গদৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা ছিল। এজাতীয় কবিতা কবির সামাজিক প্রগতিদৃষ্টি, তথা নিছক রঙ্গরসিকতার মনোভাব থেকে জন্মেছে। সংখ্যাব দিক থেকে এরা নগণ্য নয়, উৎকর্ষের দিক থেকেও এরা অকিঞ্চিৎকর নয়।

পাঁচ। দেশ-বিদেশের কাব্যসমুদ্র মন্থন করে ভাষান্তরিতকরণে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেব ক্ষমতার একটি বৃহৎ অংশকে নিয়োজিত করেছিলেন।

মৌলিক প্রেমের কবিতাও কিছু তিনি লিখেছিলেন, তবে তাতে মামুলী ববীন্দ্রানুসরণই প্রবল। অন্যান্য বিবিধ বিষয় বিভিন্ন সময়ে তাঁকে আকর্ষণ কবেছে। এজাতীয় আমন্ত্রণে সাড়া দিতে তিনি প্রায় কখনই কার্পণ্য কবেন নি।

উপরে উল্লিখিত নানা শ্রেণীর কবিতার মধ্যে সাধারণভাবে দুটি ক্ষেত্রে রচনাগত অনেকটা সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। (লঘু

খেয়ালী কবিতার বিশিষ্ট রসের নিবেদনে এক ধরনেব সার্থকতা কবি লাভ করেছেন।) একে যথার্থ কাব্য-সার্থকতা বলা কঠিন। (গম্ভীরের রাজ্যে এর প্রবেশমাত্র নেই। আবাব ব্যঙ্গ-কৌতুক বসের কবিতায়ও সত্যেন্দ্রনাথেব কৃতিত্ব একেবাবে অকিঞ্চিৎকব নয়। অন্যত্র (এক্ষেত্রে অনুবাদ-কবিতাব প্রসঙ্গ আসে না) সৌন্দর্যদৃষ্টিব সিদ্ধিতে কবি ক্বচিৎ পৌঁছেছেন। এ থেকে তাঁব কবিচিত্তেব কেন্দ্রভূমির পরিচয় নিতে এই সিদ্ধান্ত কবতে হয় যে, সত্যেন্দ্রনাথ সিরিয়াস কবিতা অনেক লিখেছেন, কিন্তু সেই পবভূমে তিনি স্বচ্ছন্দ নন। তাঁব কবিমনেব জাগবণ সেখানে ঘটে নি। তাদেব সাফল্য তাই একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ। কবিচিত্তের বাহির মহলে তিনি যতই রাজনীতি-সমাজনীতি বিষযে সচেতনতা দেখান না কেন, অন্দবে পলায়নবাদী, লঘু কল্পনাব বাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন, ব্যঙ্গ-কৌতুকেব মধ্যে তাঁব কবিমন সামাজিক চেতনাব দায়িত্ব শেষ করেছে। আসলে non-serious-য়েব কল্পনাতেই তাঁব বিহাব।

কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত কবিব বেশিব ভাগ কবিতাকে একেবারে নাকচ করে দেয়। উপবোক্ত প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কবিতাগুলিকে কোনো দিক থেকেই কবিব ঐ লঘুতবল, ব্যঙ্গমুখব, পলায়নবাদী চিত্তকেন্দ্রেব সঙ্গে সম্পর্কিত কবা চলে না। বিশেষ কবে দুই শ্রেণীর মধ্যে এমন কিছু কবিতা আছে (তাদেব সংখ্যাও উড়িয়ে দেবাব মত অকিঞ্চিৎকব নয়। দু-পাঁচটি কবিতাব ব্যাপাব হলে তাকে আকস্মিক সাফল্য বলে মনে কবা যেত।) যাদেব কাব্যমূল্য অনস্বীকার্য। এদেব প্রতি দৃকপাতমাত্র না করে কবিচিত্তের কেন্দ্রে পৌঁছান যায় বলে মনে কবি না। সিরিয়াস কবিতা লেখায় তাঁব যাবতীয় চেষ্টা যদি কৃত্রিমতা মাত্র না হয় তবে এদেব সাক্ষ্য গ্রহণ করাব প্রয়োজন আছে।

সত্যেন্দ্রনাথের গম্ভীর রসের কবিতার মধ্যে এমন কিছু রচনা আছে যাদের কাব্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। এদের সবগুলিই অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা এমন কথা বলি না। তবে এগুলির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসের উল্লাসের পরিচয় আছে। তাঁর মত কবির উল্লাস অবশ্য রোমান্টিক গীতিধারার শতমুখে উৎসারিত হবার নয়। তবু এ কবিতাগুলিতে সত্যেন্দ্রনাথ দর্শকের নৈর্ব্যক্তিকতা, জ্ঞানচর্চার আনন্দ তথা রাজনৈতিক-সামাজিক মতামত প্রচারের চেষ্টা থেকে উর্দ্ধে উঠেছেন; তাঁর মধ্যের কবি এখানে জাগ্রত। সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রাণের ভিত্তি-অনুসন্ধানে এই সত্য এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

দ্বিতীয়ত, উল্লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে কোন কোন বিশিষ্ট সূত্র ধরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য আবিষ্কার করা সম্ভব। এখানেই মিলবে তাঁর কবি-আত্মার সত্যিকার কেন্দ্রবিন্দু।

তিন ॥

সত্যেন্দ্রনাথের যুগে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে বন্যা এসেছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পূর্বের অধ্যায়ে নিয়েছি। এই আন্দোলন জাতীয় যৌবনশক্তিকে মুক্তি দিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই যুগের বস্তুতথ্যে তাঁর বহু কবিতার বহিরঙ্গ ভরে দিয়েছেন, কিন্তু কর্মতৎপরতায় এর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন নি বা চানও নি। তা হলে কি তাঁর কবিচিত্তের দিক থেকে এ যুগ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে? কবি কি আপন অন্তরাত্মার কোনোরূপ প্রেরণানিরপেক্ষভাবেই শুধুমাত্র বাহির মহলের মতবাদ, বোধ ও বুদ্ধির অনুগত হয়ে অজস্র সংখ্যায় স্বদেশানুরাগের কবিতা লিখে গিয়েছেন? কবি রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলন;

অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ভূমিকায় স্থাপিত স্বদেশানুরাগের প্রবাহে নজরুল ইসলামের মত ভেসে যান নি, আপনার ব্যক্তিত্ব-কবিত্ব বিগলিত হয়ে তরঙ্গিত হয় নি সে ধারা-স্রোতে। কবিতা হিসেবেও এদের অধিকাংশই ব্যর্থতা বহন করেছে। এই সব কবিতা কবির চিত্তের প্রকৃত কাব্য-উৎস থেকে জাত নয়, অন্যবিধ নানা উপকরণের আকর্ষণে তারা কেন্দ্রচ্যুত। কিন্তু সেই উৎস এসব কবিতার জন্মস্থল থেকে দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্বে বিরাজ করে নি। সেখানকার কিছু উত্তাপ এদের জন্মস্থলেও সঞ্চারিত হয়েছে। ঐ উৎসটিকে বলা যেতে পারে যৌবনের কঠিন শক্তি। যুগ যদি সত্যেন্দ্রনাথের কবি-আত্মার নির্মিতিতে কোনো দিক থেকে কিছু ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে তবে তা এখানে। যুগের প্রাণরসের নির্যাসরূপে যৌবনের শক্তির প্রেরণাকে আপন অন্তরে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রসঙ্গে রচিত একটি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ 'যৌবনে দাও রাজটিকা' বলে আহ্বান জানিয়েছেন—

আমরা সবুজ সঙ্কোচে, আমরা তাজা,—গৌরবে,
আমোদ করি সবুজ মোহে উশীর-ঘন-সৌরভে,
আমরা কাঁচা আমরা সাঁচা মরাকাঁচার নাই খেয়াল,
আমরা তরুণ ভয় করিনে ঝোড়ো হাওয়ার রুদ্রতাল।

বুক পেতে নিই হাস্যমুখে রৌদ্র খর বৈশাখী,
স্নিগ্ধ-মধুর শ্যামল সরস মদির ছায়ার হই সাকী,
ভাঙা মেঘ আর ঝরা পাতায় সাজায় রবি গৈরিকে
আমরা তপে পেলাম সবুজ—গৈরিকেরি বৈরীকে।

কবি দেশ-বিদেশের মহাচাঞ্চল্য, কর্মযজ্ঞের সুবিপুল অনুষ্ঠানের

শরিক হন নি। পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছেন। কিন্তু সে আগুনের উত্তাপ তাঁর মনের সুপ্ত যৌবনকে জাগিয়েছে—

যৌবনের আজ জন্মতিথি—জগৎজুড়ে উন্মাদন!

অথবা,

যৌবনের এই প্রবাল-রাঙা দুকূল-ভাঙ্গা প্রাবল্য;

বুকের মধ্যে সেই 'বনমানুষের হাড়' ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, সমগ্র প্রাণ-ঝড়ে সহস্ররূপে যাব আত্মপ্রকাশ—

বনের হাওয়া উঠল মেতে ছুটল ভুবনে!
মনের পাগল জাগল, ওসে জান্‌ল কেমনে!
ঘরবাসী তুই মনরে আমার পিঞ্জরে তোর বাড়,
(তবু) পঞ্জরে তোর জাগ্‌ছে কি ও? বনমানুষের হাড়!

এই যৌবনশক্তি কালাপাহাড় তৈমুরের গতির প্রবলতা এনেছে, এরা—

বেরিয়ে গেছে মৃত্যু-নেশায় মত্ত মাতালে,—
ঘূর্ণি হাওয়ায় ছুটিয়ে ঘোড়া মর্ত্যে পাতালে!

কবি যেন নিজের সর্ব সক্রিয়তা ও চাঞ্চল্যবিরোধী বুদ্ধিজীবী মনকে এই নব মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন,—

(ওসে) মানেই না' বেদের পুঁথি কিম্বা বেদব্যাস!
জালিয়ে কেতাব আগুন পোহায় এমনি বদ্‌ অভ্যাস!
আগুন লাগায় ভূত যে ভাগায় দেয় করে সাবাড়।

কিন্তু যৌবনশক্তি তাঁকে প্রগল্‌ভ কর্মে মুক্তি দেয় নি, চিত্তকে উত্তাপ দিয়েছে, লীলায়িত লালিত্য থেকে উদ্ধার করে কাঠিন্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'ঝোড়ো হাওয়া'-য় কবি নূতন দিনের জন্য কামনা জানিয়েছেন—

ঝড়ের তালে নাচরে ধূলি উড়িয়ে ধূসর কেশ।
রুদ্রজটা পড়বে ছিঁড়ে—জুড়িয়ে যাবে দেশ।

সর্ববিধ দুর্বল ভাবালুতার অবসান চেয়েছেন; রুদ্রের স্পর্শে বীর্যের সত্যে জাগরিত হবার 'বজ্রকামনা' প্রকাশ করেছেন—

ওগো বজ্রের রাজা অস্ত্র তোমার
হান একবার বেগে,—
এই ক্ষীণ বাষ্পের দীন উচ্ছ্বাস
পরিণত হোক মেঘে;
ওগো ঘনায়ে মিলায়ে কর সুনিবিড়
তড়িত-জড়িত স্বরে,
আজ বধ-ভয় ভুলি বন্ধ্যা ধরণী
বজ্র কামনা করে।

'মহাসরস্বতী' নামে একটি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ যে দেবীর বন্দনাগান করেছেন তাঁর পরিচয় দিয়েছেন 'চিত্তময়ী' বলে; অর্থাৎ কবি সচেতনভাবে আপন চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে এই মহাসরস্বতীর কল্পনা করেছেন। এই দেবীর কবি-কল্পিত রূপের সাক্ষ্য উদ্দিষ্ট ভাবকেন্দ্রে পৌঁছতে সহায়তা করতে পারে। কবি তাঁকে শক্তির বিভূতি বলে বর্ণনা করেছেন, সূর্যসুপ্ত ভর্গদেব এই দেবীর স্বপ্নেই সদা মগ্ন, তাঁরই রুদ্রতালে দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত; যুগসন্ধ্যার আকাশে রক্তরশ্মি রুষ্ট তারা রূপে তাঁর নিত্য উদয়, ভার্গবের ভীষণ কুঠারকে তিনি অকুণ্ঠিত করেন, আর সর্বোপরি—

গোত্রমাতা মুদ্‌গলানী ঋগ্বেদ বাখানে বীর্য যার—
ইষ্ট তুমি তার।

স্বর্যে রাখি যন্ত্রপরে ছেদিল যে জ্যোতি,—
তুমি তার মতি।

পুরাণকাহিনী ও ভাবাসঙ্গ মথিত করে ধ্বনিগাম্ভীর্যে ও চিত্রকল্পনায় বীর্যকে সার্থকভাবে ধরে রাখায় কবির চেষ্টা এখানে সফলতা লাভ করেছে। কবিতাটির বাচ্যার্থকে বিদ্ধ করে যে রসাবেদন পাঠক-চিত্তে সঞ্চারিত হয় তা হল পৌরুষের মাহাত্ম্য ও সর্ববাধা-লঙ্ঘনকারী যৌবনের শক্তির গৌরব। সত্যেন্দ্রনাথের শিল্পীমনের যে কেন্দ্রীয় প্রত্যয়টিকে ধরবার চেষ্টা আমরা করছি কবি নিজেও অংশত হলেও সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন তার কিছু প্রমাণ আছে আলোচ্য কবিতায়।

॥ চার ॥

বৈষ্ণব ভাবালুতা সত্যেন্দ্রযুগের বহু কবিরই একটি সাধারণ প্রাণ-ধর্ম। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায় প্রমুখ সমকালীন কবিদের রচনার একটি প্রধান সুর তাঁদের বৈষ্ণবতা। রবীন্দ্রকাব্যের ব্যক্তিস্বতন্ত্র ভাবনার গভীরতার মধ্য দিয়েও বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ উঁকি মেরেছে। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রভাবনার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ স্বল্প দু-চারটি কবিতায় বৈষ্ণব ভাবপরিমণ্ডল থেকে বিষয় সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সেখানেও কোমল লীলারসের মূর্ছনা প্রকাশিত নয়।

'যমুনাজল' কবিতায় রাধাপ্রেমের আতুরতা প্রকাশিত হয়েছে—

অপ্রেমেরি হাওয়া আমার লেগেছে গায়ে;—
আন্ গো তোরা যমুনা-জল,—দে গো ছিটায়ে ;
একলা হয়ে মর্মে মরে
এক পাশে হায় আছি সরে,

আছি প্রেমের ঠাকুর ঘরের দ্বারে দাঁড়ায়ে ;
ঐ প্রেমেরি হাওয়া আমার লেগেছে গায়ে।

কিন্তু এ কবিতা মামুলী ভাববৃত্তকে অতিক্রম করে নি, চিত্তদ্রাবী প্রেমার্তি এর ভাষারূপে ধরা পড়ে নি। কবির দৃষ্টিতে ক্বচিৎ যমুনার দৃশ্যরূপ আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ভারাসঙ্গ সেই সূত্রে সামান্যত আত্মপ্রকাশ করেছে। 'যুক্তবেণী' কবিতার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ, যমুনা, বৃন্দাবন প্রসঙ্গে কিছু মননপ্রবুদ্ধ কৌতুকবিদ্ধ দৃষ্টিতে রোমান্টিক প্রেমাকুতিকে আহত করতেই কবিপ্রাণ যেন বেশি উৎসাহ অনুভব করেছে। আধুনিক ভ্রমণকারীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি বৃন্দাবন গিয়েছেন। হরিত নিকুঞ্জের চিহ্নমাত্র দেখেন নি, মাধবের স্মৃতিব বেদনায় ভারাক্রান্ত নিধুবন বিলুপ্ত হয়েছে, ইঁটকাঠে নূতন সহর সেখানে গড়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীসুলভ সনেট-আঙ্গিকে ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত অম্লরসকে সাফল্যের সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন কবি '৺বৃন্দাবনে' কবিতায়—

'বন হ'ল বৃন্দাবন শ্যামচন্দ্র বিনে'—
এ কান্না কেঁদ না আর কেহ অতঃপর,
দেখে যাও বৃন্দাবন হয়েছে শহর ;
কার সাধ্য ওরে আজ নিতে পারে চিনে ?
হরি হেথা নাই বলি' নিকুঞ্জে বিপিনে
হরিতেরও চিহ্ন নাই ; ধূলিতে ধূসর
নিধুবন ঘিরিয়াছে, প্রাচীর দুস্তর।
মাধবের মাথা হেঁট করোগেট টিনে।
বন নাই বৃন্দাবনে, হায় বনমালী,
ধূলা বালি ইঁট কাঠ ইমারৎ খালি।

'বিশ্রামঘাটে' কবিতায় ব্যঙ্গরসটি আরও উচ্চকণ্ঠ। জলের কচ্ছপ,

স্থলের পাণ্ডা এবং আকাশমার্গের হনুমানের তাড়না থেকে মথুরা-বৃন্দাবনভ্রমণকারীকে উদ্ধার করার জন্য কাতর কণ্ঠে কবি কংসবিনাশী কৃষ্ণকে আহ্বান জানিয়েছেন—

জলে কচ্ছপ ও স্থলে পাণ্ডার পো
কিলবিল্ করে, হরি!
অন্তরীক্ষে পবন-পুত্র,—
বিশ্রাম কোথা করি?…
যমুনার জল করে ছল ছল,
ছল ছল করে আঁখি
এ তিনের হাতে উদ্ধার পেতে
হরি হে তোমায় ডাকি।
কংস মরেছে, বংশ রয়েছে
আজো তিন রূপ ধরি';
তব রাজধানী দেখিতে আসিয়া
হরি! হরি! প্রাণে মরি।

আসলে কৃষ্ণ, মথুরা, বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করে যে প্রেমকোমলতার ভাবাসঙ্গ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কবি-চিত্ত কিছুমাত্র সামীপ্য অনুভব করে নি। বৈষ্ণব-ভাবরসের মধ্যে নারীসুলভ যে পেলবতা (effiminacy) আছে সত্যেন্দ্রনাথের যৌবনপ্রবুদ্ধ পৌরুষ তাকে বরণ করতে চায় নি। তাঁর ধ্যানের কৃষ্ণ তাই মূলত মাধুর্যরূপে দেখা দেন না, শক্তিরূপেই তাঁর আগমন, কঠিন বীর্যে পাপীর বিনাশের জন্য তিনি আবির্ভূত হন—

বিশ্বে আজি ওতঃপ্রোত তড়িতের সঘন স্পন্দন,
বিদ্যুতের দৌত্য চলে মিলাইতে ছিন্ন ভিন্ন মেঘে;

অন্ধকরা অন্ধকারে বন্ধ দৃষ্টি যামিনী গ্রহণ,
বন্দীর মন্দিরে হায় ক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা আছাড়িছে বেগে।···
এলে কি এলে কি ওগো গুপ্তচারী শিশু যাদুকর?
মধু-দৈত্য অধিকারে মোহ-ঘেরা মথুরা নগরে?
প্রাচীরের হের-ফের,—লোহার কবাট ভয়ঙ্কর,
তা সবে ভেঙে কি এলে অপথের মাঝে পথ ক'রে?

এই কৃষ্ণ তাঁর কাছে 'জরাভরা ভারতেব চিত্তবাসী চিত্ততরুণতা'র প্রতীক। গোপীপ্রেমেও কবি ঘোষিত হতে দেখেছেন 'নিয়ম দারুণ দেশে...তারুণ্যের জয়।' যৌবনের এই চেতনায় লালিত্য যদি কিছু থাকেও তা কিন্তু কঠিন বীর্যে উদ্ভাসিত।

কবির ঈশ্বর চেতনার যে পরিচয় তাঁর 'পরীক্ষা', 'সফল অশ্রু,' 'আকিঞ্চন', 'নমস্কার', 'দেবদর্শন' প্রভৃতি কবিতায় প্রকাশিত তাব মধ্যে রুদ্র কঠোরের ধ্যানই রূপ লাভ করেছে। ইনি সহস্র বাহু, অযুতশীর্ষ, সঙ্কেতে বাঁধেন সাগরের ঢেউ, ইঙ্গিতে হেলান গিরি। এই বিশ্বদেবতা কবিকে যখন পরীক্ষা করেন তখন সহসা বজ্রের শিখা কবির নিরালয় প্রাণের উপরে আপতিত হয়

একেবারে শত লোলিহ রসনা
লেহন করিতে লাগিল দেহ,
বিশুষ্ক তালু—লগন জিহ্বা,
ফুকারি ডাকিতে নাহিক কেহ।

এই কঠিনের সাধনার মধ্য দিয়েই তিনি 'রুদ্র মুরতি'র আরতি করতে শেখেন। ভগবান তাঁকে নূতন করে ভেঙে গড়ুন, সত্যের কঠোরতায় তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিন, কবির এই প্রার্থনা তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার ভাষারূপে বার বাব বজ্র, রুদ্র, অনল শব্দগুলির ব্যবহার কবির ভাবনালোকের বিশেষ দিকে ইঙ্গিত করছে।—

এক। সূর্য ছিল না চন্দ্র ছিল না
বজ্র জ্বালিয়া করিলে আলো

দুই। ফোটাও ফুল বজ্র-অনিল-পাতি

তিন। কুণ্ঠা, গ্লানি দগ্ধ তুমি কর
হে বজ্রধর! মর্মে এস নামি

চার। ওগো আমার দীপ্ত হুতাশন

পাঁচ। শমীতরু সম রুদ্র অনল
বহিছে শান্তমুখে

ছয়। অপ্রমত্ত অযুত হস্ত
দেখেছি,—দেখেছি তড়িৎ আঁখি

সাত। বিজলী-ঝলকে দেখেছি পলকে

অবশ্য 'পুনর্নব', 'প্রভাতের নিবেদন', 'পথের পঙ্কে', 'যথার্থ সার্থকতা', 'পিপাসী' প্রভৃতি কিছু ক্ষুদ্র কবিতায় ঈশ্বর প্রসঙ্গে কোমল কারুণ্যের ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এসব রচনার ভাব ও ভাষারূপে রবীন্দ্রনাথের ভগবৎ প্রেমমূলক কবিতার প্রভাব স্পষ্ট। মৌলিক কোন বিশিষ্টতা এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। ফলে কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একক কেন্দ্রবিন্দু আবিষ্কারে এদের ভূমিকার গুরুত্ব থাকে নি। প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখযোগ্য 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থের পরে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-ভাবনামূলক কবিতার সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রেমবিষয়ক কবিতার সংখ্যা নগণ্য নয়। অবশ্য 'বেণু ও বীণা'য় এদের সংখ্যাধিক্য এবং 'কুহু ও কেকা'র পরে গম্ভীর রসের প্রেম-কবিতা একান্ত স্বল্প হয়ে এসেছে। অর্থাৎ অপরিণতির কালে কবি যে পরিমাণ উৎসাহ অনুভব করেছেন

এ জাতীয় কবিতা রচনায় তা পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে নিশ্চিহ্নভাবে অবলুপ্ত হয়েছে। প্রেম-কবিতার রাজ্যে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন নি। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য খেয়ালী কল্পনার সঙ্গে প্রেম-বিষয়কে যুক্ত করেছেন অনেকগুলি কবিতায়। সেখানে কবির বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে, এক বিশেষ ধরনের কাব্যসার্থকতাও তারা পেয়েছে।

প্রেম-কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ কোমল ভাবপরিমণ্ডলের অধিবাসী। রবীন্দ্র-ভাবনার পথেই তাঁর পদচারণা চলেছে। অবশ্য রবীন্দ্র-অনুভূতির বস্তু-উর্ধ্ব ও বস্তুনির্যসিত অসীমাকুতিযুক্ত রসাস্বাদ তাঁর কবিতায় নেই। রবীন্দ্রকবিতার যতটুকু সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষগম্য বোধের মধ্যে ধরা পড়বার তাই-ই মাত্র সত্যেন্দ্র-প্রেম-কবিতায় স্থান পেয়েছে। 'মহুয়া' প্রভৃতি কাব্যে যে বীর্যবস্ত নবরূপ ('হে অতনু বীরের তনুতে লহ তনু') প্রকাশিত সত্যেন্দ্র দত্তে তার চিহ্ন নেই। কবির চিত্তকেন্দ্রের পরিচয় এ জাতীয় কবিতায় মিলবে না।

॥ পাঁচ ॥

(প্রকৃতির নানা প্রসঙ্গ সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বিষয়-রূপে গৃহীত হয়েছে।) এদের মধ্যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কবির পক্ষপাত প্রকাশ পেয়েছে তার সন্ধান করা যেতে পারে।

ঋতু প্রসঙ্গে কবি বর্ষার প্রতিই অধিক আকর্ষণ দেখিয়েছেন। বর্ষার নানা রূপ ও বিচিত্র ভাবাসঙ্গ তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে, কিন্তু গভীর গম্ভীর রসের কবিতা হিসেবে প্রত্যাশিত সার্থকতা এরা লাভ করতে পারে নি। বসন্ত-বিষয়ক কবিতার ফুলতনু প্রেমের প্রগল্ভ বিলাসও তাঁকে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি। তুলনামূলকভাবে গ্রীষ্মবিষয়ক কবিতায় সার্থকতা সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র কবিসত্তার জাগরণের প্রমাণ বহন করছে—

অশোক নির্মাল্য শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্মুহুঃ কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে।
দিবসের হৈমজ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে উজ্জ্বল-জাজ্জ্বল-অনিমিখ,
নিঃশ্বসিছে, নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূৰ্চ্ছিত দশ দিক্।
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল···

রুদ্রকঠিন যৌবনশক্তির প্রতি কবির আকর্ষণ এর দ্বারা কথঞ্চিৎ দ্যোতিত হয়।

(ফুলের রাজ্যে কবির প্রবেশ বাধাহীন। কিন্তু তার মধ্যেও সত্যেন্দ্রনাথের ফুলবিষয়ক সেই কবিতাগুলিই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে যেখানে প্রচলিত পেলব কোমল ও মাধুর্যময় রোমান্টিক সৌন্দর্য-কৃতিপূর্ণ পুষ্পপ্রীতি প্রাধান্য পায় নি। কবির ফুলের জগতে জরার বিবর্ণতা নেই, আছে তেজোদ্দীপ্ত রুদ্রচ্ছবি যৌবনের মূর্তি। জরার রক্তকল্প বর্ণসজ্জায় ব্যথিত পৃথিবীর হৃদ্‌পিণ্ডের অর্ঘ্য তিনি দেখেছেন, 'আফিমের ফুল'-এ আসন্ন মৃত্যুর কাঠিন্য লাবণ্যের সব স্পর্শটুকু শুকিয়ে ফেলেছে, 'আকন্দ' নীলকণ্ঠের কণ্ঠ আলিঙ্গনে ফুলরূপ ত্যাগ করে পরিণত হয়েছে পাথরকুচিতে, আর যৌবনবতী 'চম্পা'র পদপাত ঘটেছে রুদ্র তপস্যার বনে সাহসিকা অপ্সরার মত। ফুলতনু-ভ্রূধনু বাঁকিয়ে মদনোন্মত্ততার আহ্বান সে জানায় নি, সে বলেছে—

চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কভু ঝরিব না মরি;
উগ্র মদ্য সম রৌদ্র,—যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্বাদে আমি তা সহজে পান করি)।

তাঁর প্রিয়ফুল 'সূর্যমল্লিকা'—যে লুপ্ততেজ সূর্যের সৌন্দর্য পেয়ে অপরূপ রূপ-শিখায় পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটে উঠেছে কুঞ্জ ভরে, আর সেই বিষপরিপূর্ণ তনুপাত্র 'কনকধুতুরা,' আর সেই 'শিরীষ,' যার—

মাথার উপরে সূর্য জ্বলিছে
ঘিরিয়া রয়েছে তপ্ত হাওয়া,
কৃচ্ছ্রসাধন জীবন আমার
শান্তি কোথাও গেল না পাওয়া।

আবার পেলব-পরুষ 'কেতকী'র কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে যেন কবিরই আত্মনিবেদন—

সুরভি সুষমা আর কাঁটা লয়ে জন্মেছি জগতে,
পেলব-পরুষ আমি, অবিদিত নহে সে তোমার,
তবুও সার্থক করি লও ওগো লও কোনোমতে
কণ্টকের কুণ্ঠা সনে সৌরভের গৌরব আমার।

'লীলাকমল'-এর মধ্যেও তিনি শুনেছেন নিশির রাতে আলোকের অভিসার-যাত্রার কামনা, আর আলোর আলিঙ্গনে তার 'অতি অদ্ভূত মৃদু বিদ্যুৎ' রণরণির শব্দ। তাঁর 'নীলপদ্ম' সুনিবিড় নিশারূপে 'সূর্যপরাগ গর্ভে ধরেছে'।

হিমালয় পর্বতের মহিমা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় সার্থকরূপ পায় নি। সত্যেন্দ্রনাথ sublime-এর কবি নন্। অচঞ্চল হিমালয় তার পরিধির ব্যাপকতা ও বিস্ময়কর সমুচ্চতা নিয়ে কবিকে জাগাতে পারে নি। সম্ভবত এর মহামৌন তাঁর কাছে জড় বলে মনে হয়েছে। কিন্তু 'পাগলা ঝোরা' বন্ধন অসহিষ্ণু তরুণ প্রাণের উত্তেজনা ধরে রেখেছে। সমুদ্রের প্রতি কবির আকর্ষণ অধিক। এই বিষয় নিয়ে লেখা বহু সংখ্যক কবিতায় এর প্রমাণ মিলছে। সমুদ্রের বিস্তার ও গভীরতা তাঁর বিস্ময়কে ততটা উদ্বুদ্ধ করে নি। এর মধ্যে কবি এক গম্ভীর শক্তিধর যুবাপুরুষকে মূর্ত দেখেছেন। পূর্ণিমা রাতে সে সমুদ্র 'জ্যোৎস্না বারুণীর রসে অসম্বৃত' মহাউল্লাস প্রকাশ করেছে, সুবিপুল তরঙ্গ বাহুতে পুষ্পদাম

জড়িয়ে দেখা দিয়েছে 'অপূর্ব শৃঙ্গার বেশে' ('পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি')। অমাবস্যার সমুদ্র 'রন্ধ্রহীন অন্ধকার কারা'র মত 'জড়ায়ে ধরিতে চায় ক্রূর বাহু বাড়ায়ে বাড়ায়ে' ('অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি')। আর 'সমুদ্রপান' কবিতায় কবিচিত্তের কঠিন যৌবন-সাধনা শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছে---

হে নীলাম্বু! হে বিপুল! ইন্দ্রনীল-নীলাম্বর-সাথী!
সূর্যের বারুণী সুরা! যোদ্ধ দেবতার বীরপান!
আসিয়াছি শূন্য শুষ্ক;—অন্তরের তৃষ্ণার নির্বাণ
করিবারে চাহি ওহে! দ্রবীভূত অন্ধ অমারাতি!

কবি নিজের সত্য পরিচয় অনুভব করেছেন, 'ক্ষুদ্র দেহে রুদ্র মোরা সিন্ধুগ্রাসী অগস্ত্যের জাতি'। সর্ব-রস-রত্নাকর তিনি এক গণ্ডূষে পান করে 'পূর্ণ হব সর্ব রসে বজ্র-গর্ভ মেঘের মতন'। এ কবিতার সংহত ক্ষুদ্র দেহে শব্দচয়ন তথা ভাবগর্ভ চিত্ররচনায় গাম্ভীর্য এবং বীর্য বিস্ময়কর সাফল্য পেয়েছে।

গঙ্গানদী নিয়ে কবিতা লিখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ, তার মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস নেই কবির, কিন্তু 'দুর্ণমিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন-গম্ভীর পদ্মা তাঁর প্রিয় নদী, তাকে সম্বোধন করতে গিয়ে কবিও মুগ্ধ এবং আত্মহারা—

হে পদ্মা! প্রলয়ঙ্করী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগল্ভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু; নিবিড় আগ্রহ তার পার গো সহিতে
একা তুমি; সাগরের প্রিয়তমা অয়ি দুর্বিনীতে!

শীতশীর্ণ জরাগ্রস্ত 'মহানদী'র দিকে তাকিয়েও কবি স্বপ্ন দেখেছেন সেই বর্ষণপ্লাবিত দিনের যে দিন ঝড়গতি মহানদী কূলহারা প্লাবনের

পাবনী ফোয়ারা মুক্তি পাবে। এবং 'ভেসে যাবে বিঘ্ন বাধা গঙ্গাস্রোতে ঐরাবত পারা।'

'শোন নদের প্রতি' কবিতায় অবশ্য তথ্যচর্চা নিটোল সাফল্যে বিঘ্ন এনেছে। কিন্তু এই নদীর মধ্যেও কবি দেবতার হিরণ্যবাহুর রূপ দেখে উদ্বুদ্ধ বোধ করেছেন—

সৈকত-শয্যার পরে সুবিশাল বাহু যেন কার
সূচনা করিয়া শুভ স্ফুরিয়া উঠিছে বারম্বার
বলদৃপ্ত, কাঞ্চন-বরণ।

উপরে উল্লিখিত কবিতাগুলির সর্বত্র সাফল্যের পরিমাণ সমান নয়। কিন্তু সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্য কবিতার তুলনায় এরা উৎকর্ষের দাবি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, কবি-চিত্তের সংহত উল্লাস এই কবিতাগুলির উৎসে অনুভব করা যায়। এদের কাব্যমূল্যের কারণও সেখানেই। এজন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয় যে এদের মধ্য দিয়ে কবিপ্রাণের মূল প্রবণতার কিছু পরিচয় মিলবে। এই কবিতাগুলি আমাদের মূল প্রত্যয়টিকে সমর্থনই করে যে সত্যেন্দ্রনাথ যৌবন-বীর্যে বিশ্বাসী কবি, এই উপলব্ধির কেন্দ্রেই তাঁর কবিপ্রাণ আবর্তিত।

॥ ছয় ॥

সত্যেন্দ্রনাথের রাজনীতিবিষয়ক কবিতার রূপসাফল্যে সঙ্গত ভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। এ জাতীয় কবিতা রচনার ব্যাপারে কবি তাঁর অন্তর-পুরুষের প্রেরণার জন্য প্রায়ই অপেক্ষা করেন নি। বাহির মহলে ঘটনার সাময়িকতা যে সাড়া তুলেছে তাকেই কবি ছন্দে সমর্পণ করে বসেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস কবি যদি অন্তর-সত্তার জাগরণের জন্য অপেক্ষা করতেন তা হলে

তুলনায় অধিকতর সাফল্যলাভ ঘটত। সত্যেন্দ্রনাথের কবিচিত্তে সাধারণভাবে যে শক্তিধর তারুণ্য বাসা বেঁধেছিল, জাতীয়তাবাদী চেতনা বা সমাজসংস্কার-বাসনাকে তা একেবারেই অবহেলা করত এমন মনে হয় না। সমকালের নব উদ্বুদ্ধ জাতীয় চেতনার সঙ্গে কর্ম-সম্বন্ধে কবি সম্বদ্ধ হন নি, কিন্তু দেশব্যাপী সেই প্রাণচাঞ্চল্য থেকে তিনি যৌবনশক্তির মুক্তির নিশ্বাসটুকু আকণ্ঠ পান করেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের লঘু খেয়ালী কল্পনাসৃষ্ট কবিতাগুলির সাফল্য স্বীকার্য। এ সাফল্য বিশেষ ধরনের হলেও কবির প্রাণকেন্দ্র এখানে জাগ্রত, এরূপ প্রমাণ মেলে। কিন্তু কবির চিত্তভিত্তির যে পরিচয় গ্রহণ করেছি, যে শক্তিধর কঠিন যৌবনের কথা বলেছি তার সঙ্গে এই খেয়ালী কল্পনার যোগ কোথায়?

খুব যান্ত্রিকভাবে অগ্রসর না হলে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা সম্ভব। এদের মধ্যে শুধুমাত্র পলায়নবাদী মনোবৃত্তিই প্রধান হয়ে উঠেছে এমন নয়। প্রাণোচ্ছল চাঞ্চল্য দায়িত্বহীন জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে এ ধরনের অধিকাংশ কবিতা। 'সবুজ পরী' কবিতায় কবি সবুজ প্রাণকে ধূসরতার উপরে অধিকার বিস্তারের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন—

সবুজপরী! সবুজপরী! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও।

'জদাপরী' দুর্গম পথে লঘুছন্দে ডাক দেয়—

দুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস্
দুঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস্ তায় নিরাশ।

আর 'লালপরী'র তরুণ স্ফূর্তির চিত্র এঁকেছেন কবি—

ফিরছে তরুণ ফুর্তিতে
ডালিম-ফুলি কুর্তিতে!

অথবা, উপলমুখর 'ঝর্ণা'র কলহাস্যের যৌবনলীলায় কবি মুগ্ধ হয়েছেন—

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে—
গিরিদরী বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত
শ্যামলিয়া ও পরশে করগো শ্রীমন্ত;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা;
ঝর্ণা।

আবার 'বিদ্যুৎপর্ণা'য় তিনি দেখেছেন—

অশ্রুর মৌক্তিক।
হাস্যের স্ফূর্তি!
লহরের লীলা ঠিক
লাস্যের মূর্তি!

আসলে এ জাতীয় যাবতীয় কবিতার পেছনে তরুণ প্রাণের উচ্চকিত স্ফূর্তির সুরটি সর্বত্রই শোনা যায়। শক্তিসংহত যৌবন-কাঠিন্যের জীবনবোধে এ লঘুতা নেই, এরূপ খেয়ালপনা—এরূপ দায়িত্বহীন হাল্কাহাসিব ফুলঝুরি ওড়ান তাঁর স্বভাবধর্ম না হতে পারে। কিন্তু এই দুই মনোভাবের দূরত্ব অধিক নয়। জড় ও জরার বিরুদ্ধে প্রাণের জয়পতাকা ওড়ানোয় এদের মূল্যে বড় তারতম্য নেই।

॥ সাত ॥

কবির বিশিষ্ট বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কুহু ও কেকা' গ্রন্থ প্রকাশকালে কবি-পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছিলেন,

"সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যসেবায় একটি নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ছিল, সেই সত্যের অনুরোধে তিনি স্পষ্টবাদী বীর ছিলেন।" এই মন্তব্যের মধ্যেকার 'নির্ভীক' ও 'বীর' এই দুটি শব্দের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। সমালোচক মোহিতলাল সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির অন্যতম লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, "তাঁহার কবিমানসে চরিত্র ও পৌরুষ বড় অধিক প্রকট হইয়া আছে।" সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে গবেষক ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র লিখেছেন, 'সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় যৌবনের দোষ এবং গুণ দুইই বিদ্যমান।'

সত্যেন্দ্রনাথের কবিচিত্তের যে মূল স্বভাবধর্মের কথা বলবার চেষ্টা করেছি সেই পৌরুষ সেই যৌবনপ্রবুদ্ধ বীর্যবত্তার দিকে পূর্ববর্তী কোনো সমালোচকের দৃষ্টি পড়ে নি এমন নয়। কিন্তু এই বৃত্তিটিকে কবিব্যক্তিত্বের কেন্দ্রে অপর কেউ স্থাপন করেন নি। এ বিষয়ে আমার যুক্তি এই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু এ সম্পর্কে কিছু সতর্কতার প্রশ্ন আছে। সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের নির্মিতিতে কিছু বিশিষ্টতা ছিল। কবিত্বচেতনায় তাঁর অস্তিত্বের পাত্র পূর্ণ ছিল না। বহুবিধ আকর্ষণে তাঁর মন সাড়া দিয়েছে, এবং এই বিবিধ আকর্ষণসূত্রের অনেকগুলিই কাব্যত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসম্বন্ধে বদ্ধ নয়। বিচিত্রকে অন্তরের একের মধ্যে আত্মসাৎ করতে তিনি পারেন না। এই বিচিত্র উপকরণ বহুমুখী উত্তেজনা ও কৌতূহলে কবিকে কেন্দ্রভ্রষ্ট করেছে। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলীতে কেন্দ্রচ্যুতির উদাহরণ অত্যধিক বলেই তাঁর ভাববৃত্তের কোন প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু আছে কিনা সে বিষয়েই অনেকে সংশয় প্রকাশ করে থাকেন।

এই সব প্রবণতা হল তথ্যনিষ্ঠার অতিরেক, রাজনীতি-সমাজ-সংস্কারমূলক ভাব ও ভাবনার উচ্চকণ্ঠ প্রচারচেষ্টা, প্রসাধনকলার

প্রতি পক্ষপাত প্রভৃতি। কবিচিত্ত যেখানে এইসব বিচিত্র আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সেখানেই সে কক্ষভ্রষ্ট।

সত্যেন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি (লঘু সুরের কবিতাগুলি বাদ দিয়ে) প্রায়ই আকারে ক্ষুদ্র। সনেট আঙ্গিকে তাঁর সাফল্য দৃষ্টি এড়াবার নয়। তাঁর কবিপ্রাণের কেন্দ্রে বিচিত্রকে আত্মসাৎ করে একের মধ্যে রূপায়িত করার মত পর্যাপ্ত শক্তি ছিল না। তাই দীর্ঘাকৃতি কবিতায় পুনরুক্তি প্রাধান্য পেয়েছে, তথ্যের প্রাচুর্যে ভাবকণিকাটিকে কিছু বিস্তার দানের চেষ্টা আছে। অন্ত্যানুপ্রাসের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় পর পর দুই পংক্তিতে পয়ার ধরনের মিল অপেক্ষা বিকল্প পংক্তিতে মিলেই যৌবনদৃঢ় ব্যক্তিত্ব অধিক প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতার আঙ্গিকগত এই বিশিষ্টতার প্রতি কবি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারেন নি। অভিপ্রেত রস থেকে চ্যুতির অন্যতম কারণ হিসেবে এই প্রশ্নটিও অনুল্লেখ্য নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ভ্রান্ত পথিক

It is absurd to assert, as some do, that the art of the theatre is a purely aesthetic function and has nothing to do with 'propaganda', either moral, religious or political.

—T. Komisarjevsky : The theatre and a changing civilisation

কথাগ্রন্থের আলোচনায় লাভালাভের বিচার দেখিয়া হয়ত অনেকে বলিয়া উঠিবেন, নভেল শিল্পের বই। নদীর স্রোতের মত উহাতে গড়াইয়া যাইব। ইহাতে আবার লাভালাভ দেখিব কি? ...যদি এই মতটি সত্য হয়, তাহা হইলে নভেলের সংখ্যা যে এত বর্ধিত হইতেছে, ইহা পৃথিবীর পক্ষে অনিষ্টকর বলিতে হইবে। ...ফলতঃ যদিও অনেক নভেল কেবল মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সারবত্তা না থাকিলে নভেল কখনই শিক্ষা বিষয়ে এত উচ্চস্থান পাইত না। নভেল ফুলের ন্যায় সুন্দর বটে, কিন্তু ফলই ইহার পরিণাম।

—চন্দ্রনাথ বসু : নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য

॥ এক ॥

সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানসাধনায় ছিলেন নিষ্ঠাবান। গ্রন্থসংগ্রহে তাঁর বিরাম ছিল না, অসুস্থ দেহেও 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তে নিত্য গমনে ক্লান্তি আসে নি। ফার্সী ভাষা মুসলমানী চিন্তার রাজ্যে

তাঁর প্রবেশকে বাধাহীন করেছিল, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা য়ুরোপীয় জ্ঞানসমুদ্রের পাথেয় যুগিয়েছিল। জ্ঞানের ও চিন্তার যে বহুবিচিত্র আয়োজন তাঁর মনোজগৎকে প্রসারিত করেছিল তার কিছু পরিচয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তাঁর নামাঙ্কিত গ্রন্থাগারের তালিকায় পাওয়া যাবে। সামাজিক ও রাজনীতি বিষয়ক বহু তত্ত্ব, ইতিহাস ও ভূগোলের নানা তথ্য, অজস্র পৌরাণিক কথা তাঁর অধিগত ছিল। অধ্যয়নে ছিল তাঁর ছাত্রের প্রগাঢ় নিষ্ঠা এবং সংকলনে গবেষকের বিস্ময়কর অনুসন্ধিৎসা। পিতামহের যোগ্য পৌত্র হিসেবে তিনি আমাদের শ্রদ্ধা দাবি করতে পারেন। কিন্তু এ সত্যটি রসবেত্তার বিদিত থাকা বিধেয় যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য ও তত্ত্বের প্রতি কোনো বিশেষ পক্ষপাত সৎ কাব্যের নেই। এরা উপকরণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে, এদের বহু অনুশীলন কবির মনোরাজ্যকে একটা আস্বাদযোগ্য বুদ্ধির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথে চিত্তগত সেই ধাতুর অভাব যার সংযোগে তথ্যাদি আত্মস্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন বাইরের জগৎকে ভিতরের জগতে পরিণত করা, তার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, সত্যেন্দ্রনাথে তা অল্পই চোখে পড়ে। প্রায় সমকালীন সাহিত্যসেবী প্রমথ চৌধুরীর সনেটে আহৃত জ্ঞান ও অধ্যয়নের প্রাচুর্য যেমন একটা বুদ্ধিদৃপ্ত মননশীলতার সৃষ্টি করেছিল, সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। তথ্য, তত্ত্ব ইত্যাদি তাই সেখানে ভারের সৃষ্টি করেছে, আস্বাদ্য রসের উদ্বোধনে সার্থক হয়ে ওঠে নি। এ কারণে তাঁর বহু কবিতায়ই রূপহীন তালিকা রচনার প্রাচুর্য চোখে পড়ে। তথ্য-পুঞ্জের সৌন্দর্য-বিরহিত এবং অনুভূতির স্পর্শশূন্য উপস্থাপনা, ঘটনা-রাজির শিথিলবদ্ধ গ্রন্থন, পুরাণ-কাহিনী ও ঐতিহাসিক ঘটনার

মুহুর্মুহু উল্লেখ কবিতার প্রকৃত সার্থকতায় বাধার সৃষ্টি করেছে। খণ্ড কবিতায় বা গীতিধর্ম রচনায় এদের আধিক্য কবিমনের বহু অধ্যয়নের সংবাদ বহন করে, অনেক সময়ে প্রথম তারুণ্যের প্রগল্‌ভ প্রকাশ বলেই এদের মনে হয়।

একদিকে তথ্যের অতিরেক অন্যদিকে রাজনৈতিক-সামাজিক মতবাদ প্রচারের উচ্চকণ্ঠ চেষ্টা। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার একটি প্রধান অংশ এই চেষ্টার ফল।

মতবাদের দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের প্রগতিশীল ভূমিকা অবশ্যই শ্রদ্ধেয়। সমকালের পক্ষে তাঁর রাজনৈতিক বোধের স্বচ্ছতাও প্রশংসনীয়। নজরুলের মত কবিও (ব্যক্তিগত জীবনে যিনি রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন) যতটা ভাবপ্রবণতার মধ্য দিয়ে সমকালীন রাজনীতির গতিকে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন, ততটা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট বোধের মধ্যে তাকে আয়ত্ত করতে পারেন নি। নজরুলের মতবাদের প্রগতিধর্ম যতটা উচ্চকণ্ঠ, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ততটা তীক্ষ্ণ নয়। আবার কুমুদরঞ্জনের মত কবির রাজনৈতিক বোধের সঙ্গেও তাঁর কতই তফাৎ। কুমুদরঞ্জন স্বাধীনতালাভের পরবর্তীকাল পর্যন্ত পরিবর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছেন। কিন্তু ইংরেজদের প্রতি ঊনবিংশ-শতকসুলভ শ্রদ্ধা মিশ্রিত প্রতিবাদের অধিক তাঁর রাষ্ট্রনীতির চেতনা এগিয়েছে, তাঁর কবিতায় এমন প্রমাণ নেই। স্বাধীনতাকামনা ও বিশ্ব-সংস্কৃতির মৈত্রীর মধ্যে একটা অস্পষ্ট অস্বচ্ছ মিশ্রণ সেখানে লক্ষ্য করা যায়। অতদিন আগেই সত্যেন্দ্রনাথের চিন্তার যুক্তিপ্রবুদ্ধ সমগ্রতা তাই নিঃসন্দেহে প্রশংসা আকর্ষণ করবে।

সত্যেন্দ্রনাথের এ জাতীয় কবিতাগুলিতে চিন্তার তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। এক। বিশ্বমানবতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব তথা মানবমৈত্রীর প্রতি অটুট শ্রদ্ধা। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমানবতার আদর্শ লঙ্ঘনকারীদের প্রতি বিতৃষ্ণা। দুই। পরাধীন ভারতের মুক্তি-কামনা; ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি মনীষীদের সমুচ্চ জীবন-সাধনার গৌরবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ; দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদ এবং অতীত ঐতিহ্যের মহিমাস্মরণ। তিন। দেশীয় নানা সঙ্কীর্ণ সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ। রাজনীতি ও সমাজ-নীতি বিষয়ে অতি স্বচ্ছ চেতনা না থাকলে উপরোক্ত তিনটি সূত্রের মধ্যে জট পাকিয়ে যেতে পারে। বিশ্বমানবতার বাণী যাঁর কণ্ঠে অত্যুচ্চ, জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নকে তিনি ততটা মূল্য দিতে চান না। আবার সামাজিক অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতির দিকে তাকিয়ে অনেক চিন্তানায়ক তাঁদের সংশোধনকে অগ্রাধিকার দিতে চান, জাতীয় স্বাধীনতার কামনাকে নয়। বিচিত্র সামাজিক অপূর্ণতা সংশোধনের কাজে হাত না লাগিয়ে স্বরাজসাধনা রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পায় নি। এরূপ চেষ্টাকে কবি বলেছিলেন, "to build a political miracle of freedom upon the quick sands of social slavery." তাই তাঁর মতে, "Nationalism is a great menace. It is the particular thing which for years has been at the bottom ot Indian troubles." এই চিন্তার বশবর্তী হয়েই রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা আন্দোলনবিষয়ক কবিতা লেখায় বড় উৎসাহ বোধ করেন নি (বঙ্গভঙ্গের যুগের প্রত্যক্ষ কারণটি কিছু অন্যরূপ ছিল)। কবির রাজনৈতিক সচেতনতা সমর্থনযোগ্য নয়, একে বড় বেশি একদেশদর্শী বলে মনে হয়। এবিষয়ে তৎকালীন চরমপন্থীদের অন্যতম নেতা অরবিন্দ ঘোষের ঘোষণার যৌক্তিকতা অধিক বলে

মনে হয়, "Political freedom is the life-breath of nation ; to attempt social reform, education reform, industrial expansion, the moral improvement of the race without aiming first and foremost at political freedom, is the very height of ignorance and futility." অবশ্য সমাজসংস্কারের সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে অস্পৃশ্য বা বর্জনীয় করে রাখবার প্রশ্ন ওঠে না। তবে স্বাধীনতা চেষ্টার তুলনায় তাকে প্রাধান্য দেওয়াই কর্মী ও নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ধিকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথেব দীর্ঘ সাহচর্য সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁব মতে দীক্ষিত হন নি। তিনি সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকাব করেছেন, জাতীয় স্বাধীনতার কামনাকে তাব চেয়েও গুরুত্ব দিয়েছেন—সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা এই সাক্ষ্যই দেয়। এমন কি ববীন্দ্রনাথেব প্রশান্ত নিখিল মানবমৈত্রী যখন জাতীয়তার পাদপীঠ ছাড়াই বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে উঠতে চেয়েছে তখনও সত্যেন্দ্রনাথ এই দুই ভাবনার মধ্যে কোন প্রকৃত দ্বন্দ্ব দেখতে পান নি।

সত্যেন্দ্রনাথেব চিন্তায স্বচ্ছলতা ছিল, সাধারণের গ্রহণযোগ্য স্পষ্টতা ও যুক্তিসূত্র ছিল তা রবীন্দ্রনাথসুলভ অতি গভীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-পুষ্ট একান্ত মৌলিক চেতনা ছিল না।

বিষয় হিসেবে রাজনীতি-সমাজনীতিঘটিত ভাবনা কাব্যের রাজ্যে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। কিন্তু এই সমুদয় বস্তু কবিচিত্তের সংযোগে বিশিষ্ট রূপ পেলে তবেই ভাবের বিষয় হয়ে উঠতে পারে, কাব্য-সৃষ্টিতে অবিচল আসন করে নিতে পারে। কবি-ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শহীন রাজনৈতিক-সামাজিক বক্তৃতা-বিবৃতি জ্ঞানরাজ্যেই প্রবেশপথ পেতে পারে, প্রকৃত কাব্যসংসারে নয়। অর্থাৎ, প্রথমত চাই কবি-ব্যক্তিত্বের স্পর্শ। রাজনীতির বিষয়ে সাধারণের অধিকার বিস্তৃত। কবির কাব্যধৃত বাণী তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি। জগতে

রাজনীতির সাধারণ বিষয় কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধির সত্যে পরিণত হওয়া চাই। সত্যেন্দ্রনাথে প্রায়ই এই ব্যক্তিস্পর্শ প্রাপ্তব্য নয়। দ্বিতীয়ত, এই সকল বিষয় আবার বাণীবিন্যাসে, চিত্রকল্পের প্রয়োগে রূপধৃত সত্য হয়ে ওঠা চাই। সত্যেন্দ্রনাথে এসব বস্তু কোথাও সাধারণ জ্ঞানগম্য তত্ত্বহিসেবে, কোথাও বা মঞ্চ-বক্তৃতার আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাইরের ঘটনা কবি-চিত্তকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে তীব্র আর্তি জাগিয়েছে এমন পরিচয় এ কবিতাগুলিতে বড় নেই। নজরুল ইসলামের এই জাতীয় কবিতায় অনুভূতির যে প্রবলতা, আবেগের যে তীব্রতা, সর্বপ্লাবী বিদ্রোহের চিত্তোদ্বেলকারী যে আহ্বান পাঠক-চিত্তকে সবলে আকর্ষণ করে, সত্যেন্দ্রনাথে তার চিহ্ন নেই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় উপলব্ধির উত্তাপের স্থলে, ভাবাবেগ স্পন্দনের স্থান দখল করেছে নিরুদ্বেগ তথ্যগত উপমা-উদাহরণের প্রচুর যোজনা।

/. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে বাংলা খণ্ড কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। সেখানেও কবির ব্যক্তি-চেতনা সাধারণ রাজনীতির বোধকে আত্মসাৎ করে নিজের ব্যক্তিবোধে পরিণত করতে পারে নি। রূপরচনায় কাব্যসিদ্ধিও আসে নি। সেখানে উচ্চকণ্ঠ মঞ্চবক্তৃতা এবং ইতিহাস ভূগোলের সুপ্রচুর তথ্য-চয়ন প্রচারধর্মকে প্রশ্রয় দিয়েছে, কাব্যধর্মকে বর্ধিত করে নি। এর ফলে জনপ্রিয়তা লাভ সহজ হয়। সে জনপ্রিয়তা থেকে সত্যেন্দ্রনাথও বঞ্চিত ছিলেন না, কিন্তু কাব্যমূল্যের দিক থেকে এদের খর্বতা বহুজন-কণ্ঠের অভিনন্দনও ঢেকে দিতে পারে না।

॥ দুই ॥

এমন মানুষ জগতে নেই যার মন ক্ষণিকের জন্যও স্বদেশের গর্বে স্ফুরিত হয়ে ওঠে নি। এক ইংরেজ কবি কথাটা বলেছিলেন। কথাটা সত্য। আর এমন কবির সাক্ষাৎলাভও দুর্লভ যাঁর রচনার অন্তত কোনো কোনো অংশে দেশমাতৃকার জন্য গৌরব বোধ প্রকাশিত না হয়েছে। অবশ্য কারও কবিতা-সম্ভারে এটি একটি প্রধান সুর। সত্যেন্দ্রনাথ শেষোক্ত শ্রেণীর কবি।

মধুসূদন সনেটে স্বদেশপ্রকৃতির সৌন্দর্যে গর্ব প্রকাশ করেছেন—

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেনআদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসাগীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদমণ্ডলে
(তুষারে বাপিত বাস উর্ধ্ব কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ !) হেরি ভীষণ মূরতি ;—
যে দেশে কুহরে পিক বসন্ত কাননে,
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী,—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-স্বপনে,—
সে দেশে জনম মম, জননী ভারতী ;

হেমচন্দ্রপ্রমুখ কবিরা স্বদেশচেতনাকে কবিজনোচিত সৌন্দর্য ধ্যানে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলেন না, জনমনে স্বাজাত্যবোধকে উদ্বোধিত করবার প্রত্যক্ষ প্রচারধর্মে তাঁরা এই কবিতাগুলিকে ব্যবহার করতে চাইলেন। ফলে প্রকৃতিসৌন্দর্যের বর্ণনার তুলনায়

জাতির অতীত ইতিহাসকথা প্রাধান্য পেল, পাঠককে দেশের অতীত গৌরব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে চাইলেন কবিরা।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথও দেশজননীর বন্দনামূলক অনেক কবিতা ও গান লিখেছিলেন। পরবর্তীকালেও এ জাতীয় রচনা একেবারে লেখা হয় নি, এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ দেশের কোমলপেলব শ্যামল এক জননীমূর্তিকে এই সব রচনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ক্বচিৎ কখনও তাঁর রুদ্ররূপের ছবি আঁকলেও (ডান হাতে তাঁর খড়্গ জ্বলে) কোমলাখ্য ভাবকান্তিই তার অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত, প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে তিনি কল্যাণ বর্ষণ করেছেন চতুর্দিকে।

রবীন্দ্র-ভাবনাদ্বারা সত্যেন্দ্রনাথ গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন তাঁর কাব্যসাধনার প্রথম দিকে। 'সন্ধিক্ষণ' কবিতা লিখে তিনি বঙ্গভঙ্গবিরোধী কর্মতৎপরতাব সমর্থন জানালেও 'বেণু ও বীণা' এমন কি 'হোমশিখা' রচনার কাল পর্যন্ত রাজনীতি-ভাবনা তাঁর কবিতার প্রধান স্থর হয়ে ওঠে নি।

প্রথম দিকে লেখা তাঁর দু-একটি কবিতা ও গানে দেশমাতৃকার সৌন্দর্যধ্যানে মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। এদের ভাবকল্পনায় ও রূপচিত্রণে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দৃষ্টি এড়ায় না। এরা যথেষ্ট মৌলিক না হলেও আন্তরিকতায় ন্যূন নয়। বিশেষ অনবদ্যতার দাবি না থাকলেও ব্যর্থতার লাঞ্ছনাও এরা বহন করে না। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা চলে 'মধুর চেয়েও আছে মধুর—সে এই আমার দেশের মাটি' কিংবা 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল।' কোমলতা, শ্যামলতা এবং মাধুর্য এদের মধ্যে ভাষা-রূপে ধরা পড়েছে; অবশ্য প্রথমোক্ত কবিতাটিতে খেয়ালী কল্পনার আধিক্য লক্ষণীয়। এ-জাতীয় রচনার সংখ্যা অবশ্য বেশি নয়।

কিন্তু বিশুদ্ধ প্রকৃতিসৌন্দর্যের প্রেরণায় দেশবন্দনামূলক কবিতা রচনায় তিনি উৎসাহ বোধ করেন নি। বরঞ্চ তাঁর প্রেরণার উৎসে জাতীয়তাবাদী চেতনাই মূলত কার্যকর। প্রকৃতি-সৌন্দর্যপ্রসঙ্গে গৌণত্ব এসেছে। সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলির প্রধান লক্ষণ হল—

এক। কবির স্বদেশচেতনা বঙ্গদেশকেই প্রধানত আশ্রয় করেছে, ভারতভূমি প্রসঙ্গে লেখা কবিতা দু-একটি মাত্র আছে।

দুই। দেশের প্রকৃতিসৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করেছে, তার পরিচয় এ জাতের অধিকাংশ কবিতায় অল্পাধিক পাওয়া যাবে।

তিন। দেশের অতীত কীর্তিকথনে কবি পঞ্চমুখ। এই সূত্রে ধরে পুরাণ-ইতিহাসের সুপ্রচুর তথ্য কবিতার দেহে স্থান করে নিয়েছে।

চার। দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ (উৎপাদন দ্রব্য প্রভৃতি) এই সব বিষয়ক তথ্যের প্রাচুর্য এবং তার জন্য গৌরব বোধ আছে।

পাঁচ। অতীত গৌরব এবং বর্তমান অগৌরবের বৈপরীত্য তুলে ধরে পরাধীনতার বেদনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন কবি।

ছয়। নানা তথ্যের মধ্যে থেকেও কবির বিশেষ ধ্যানরূপটির আভাস পাওয়া যায়। তাঁর চেতনার বঙ্গজননী শক্তিরূপা সিংহ-বাহিনী। যদিও কবি এই ভাবকেন্দ্রে সর্বদা সুস্থির থাকতে পারেন নি। কোমলাখ্য ভাবটির অনুপ্রবেশ রূপের নিবিড়তার হানি ঘটিয়েছে।

'বঙ্গজননী' কবিতায় তিনি বাঙালির শক্তিসাধনাকে ভিত্তি করে এক নারীমূর্তির মধ্যে দেশমাতৃকাকে কল্পনা করেছেন—

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস বিরস মুখে ?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল মালা ঘুমায় বুকে !

বঙ্কিমের আনন্দমঠে অঙ্কিত দেশমাতৃকার ত্রিমূর্তির প্রভাব এ কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করেছে সন্দেহ নেই। বাচনভঙ্গির বিশিষ্টতার জন্য কবিতার সমাপ্তির শ্লোগানমুখী পংক্তি কটিও চিত্রকল্পে দানা বেঁধে উঠে কাব্যসাফল্য পেয়েছে—

বাঘেরে তোর রাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে ;
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি—ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,
গৌরবিনী মূর্তি ধর—শ্যামাঙ্গিনী-বঙ্গভূমি।

কিন্তু ক্ষুদ্র এই কবিতার মাঝখানে অর্থনৈতিক শোষণের যে তথ্যগত বিবরণ কবি উপস্থিত করেছেন—

মা তোর ক্ষেতের ধান্যরাশি জাহাজ ভরে যায় বিদেশে,
অন্নসুধা গরল হয়ে ফিরে আসে মোদের পাশে,
বনের কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে, চেয়ে,
অন্ন বসন বিহনে হায়, মরে তোমার ছেলে মেয়ে।

তা বঙ্গজননীর সামগ্রিক রূপকল্পনাকে শিথিল করে ফেলেছে।

'আমরা' সত্যেন্দ্রনাথের বহুপঠিত কবিতাগুলির অন্যতম। এই কবিতার খ্যাতি যতটা কাব্যমূল্য ততটা নয়। কবিতার আকারে, স্বচ্ছন্দ ছন্দে কিঞ্চিৎ আবেগের স্পর্শে বাঙালি জাতির আত্মশ্লাঘা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়ের মূল্যে এর মূল্য, রচনাসম্ভোগে নয়। বঙ্গদেশের প্রকৃতির রূপাঙ্কন দু-একটি পংক্তিতে মাত্র কাব্যসৌন্দর্যে ধন্য হলেও প্রধানত কবির ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রকাশরূপেই দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্য তো আছেই। উৎসাহের আতিশয্যে বহু অধ্যয়নে প্রাজ্ঞ কবি বিচারবুদ্ধিকে মাঝে মাঝে বিসর্জন দিয়ে বসেছেন। অজন্তার শিল্পী, বরভূধর ওঙ্কারধামের ভাস্কর, সাংখ্যদর্শন প্রণেতা সবাইকে নির্বিচারে বাঙালি বলে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। যুগে

যুগে জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পসৃষ্টির বিভিন্ন শাখায় বাঙালির গৌরব-অবদানের বিস্তৃত তালিকার মালা গেঁথেছেন কবি। এ তালিকা বিবৃতিধর্ম অতিক্রম করে চিত্ররূপে ধন্য হয় নি; কচিৎ যেসব চিত্রের আভাস এসেছে তথ্যের অতিচাপে তা তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া বিচ্ছিন্ন সংবাদের টুকরো যে সূত্রে গ্রথিত হয়েছে তার মধ্যে লেখকের স্বাজাত্যাভিমান আছে কিন্তু রূপভাবনার কোন বিশিষ্টতা নেই। বাঙালি জাতির কোন বিশিষ্ট স্বরূপ তিনি কল্পনাকেন্দ্রে স্থাপন করে এই তথ্যগুলিকে তার সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন নি, ফলে একটা রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যমুখী অস্পষ্ট গৌরববোধ ব্যতীত অন্যবিধ ফলশ্রুতিতে এ রচনা গিয়ে পৌঁছায় না।

'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' 'আমরা'-র সমগোত্রীয়। 'আমরা'-য় ইতিহাস-কথার প্রাধান্য, বর্তমান কবিতায় ইতিহাস-পুরাণ প্রসঙ্গের সঙ্গে মুখ্য হয়ে উঠেছে প্রকৃতির কথা। কিন্তু কোনো গম্ভীর গভীর কল্পনার মাধ্যমে প্রকৃতি এখানে ধরা পড়ে নি, লঘু তরল কল্পনায় কবি বিচিত্র সম্পর্কহীন ভাবনা, বস্তু ও দৃশ্যের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছেন।

ভাঁটফুলে তোর আগুন ঝাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়,
ভাট-শালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক ধায়,
নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সঙ্গীতে,
অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চেরাপুঞ্জিতে।

কবি কল্পনা করেছেন, বঙ্গদেশ-রূপিণী মহিয়সী নারীর শিরে হীরক কিরীটী জ্বলছে হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, অসংখ্য নদনদীতে মিলে গড়ে তুলেছে গলার সাতনরী হার, মাথার ঝাপ্টা সিঁথি, কর্ণভূষণ। বহুবর্ণরঞ্জিত প্রজাপতি তাঁতীর মতন বুনে চলেছে এই দেবীর চেলী, গগনভেড়ের কর্কশকণ্ঠ আকাশমার্গে সদাপ্রহরায় জাগ্রত। এ জাতীয় বিবরণ বালসেব্য কবিতায় উৎসাহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি

করতে পারে, কিন্তু তথ্যনিষ্ঠা ব্যতীত রচয়িতার সৃষ্টিক্ষমতার বিশেষ কোনো পরিচয় বহন করে না। নিসর্গবস্তুকে রূপহীন শুষ্ক তথ্যরূপে ব্যবহার করার এরূপ নির্বিকারত্ব কবিসমাজে দুর্লভ। কবিতাটিতে কিংবদন্তী ও ইতিহাস-ঘটনার সুপ্রচুর ইঙ্গিতও স্থান পেয়েছে। তথ্যের সমাবেশের মধ্য দিয়ে গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির কোন বিশিষ্ট মূর্তি-কল্পনা স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি। কবিতাটির প্রারম্ভে জাতীয় ঐতিহ্যের নির্যাসপুষ্ট শক্তিময়ী রূপ প্রকাশ পেয়েছে—

শিবানী তুই, তুই করালী, আলেখ্য তোর খর্পরে !
শক্র-ভীতি জলছে চিতা, তুলছে ফণা সর্প রে !
বাঘিনী তুই বাঘ-বাঘিনী গলায় নাগের পৈতা তোর,
চক্ষু জলে—বাড়ব-কুণ্ড—বহ্নি প্রলয়-স্বপ্ন-ভোর ;

কিন্তু এই রূপ দীর্ঘ কবিতার তথ্যের বন্যায় ভেসে গিয়েছে। বিশেষত দেবীর উক্ত রুদ্র রূপের পাশাপাশি কল্যাণী মূর্তির চিত্ররচনাও তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তেই করেছেন। এই বিপরীতের সমন্বয়ের সমস্যা তাঁকে পীড়িত করে নি।) 'মৃত্যু স্বয়ম্বর' কবিতায় বাংলাদেশের বিবাহপ্রথার নির্মমতা নিয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা কবি ফেঁদেছেন। সে কবিতা প্রাণোত্তাপে ও রূপরচনায় সফল হয়ে ওঠে নি।

দেশের অতীতমাহাত্ম্য, প্রকৃতি-পরিবেশের বিশিষ্টতা, দেবীরূপে দেশমাতৃকাকে অনুভব করার চেষ্টা সব কিছুরই লক্ষ্য হল স্বাদেশিকতাবোধ। 'স্বর্গাদপি গরিয়সী', 'আশার কথা' প্রভৃতি কবিতায় পরাধীনতার বেদনা এবং নব্য জাগরণে উল্লাস প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কাব্যরূপে এদের সাফল্য আদৌ স্বীকার্য নয়। বিবৃতিধর্মেই এদের আবেদনের সীমা।

'ভারতের আবর্তি' এবং 'দ্বিতীয় চন্দ্রমা' প্রভৃতি দু-চারটি কবিতায় বঙ্গজননী নয়, ভারতমাতৃকার বন্দনা করেছেন কবি।

তবে এ প্রসঙ্গে কবি বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন নি। প্রথমোক্ত কবিতায় ছন্দের তুড়ির বিচিত্রতায়ই কবি মুগ্ধ, মাঝে মাঝে তথ্যের উল্লেখে তিনি উৎফুল্ল—

জয় জয় ভারত! জয় জয় মাতা!
ঋদ্ধির নিধান; সিদ্ধির দাতা
অক্ষয় তোমার কীর্তির গাথা! জয়! জয়!…
ডঙ্কায় তোমার ডিণ্ডিম ওঠে!
কাশগড় খোটান কম্বোজ লোটে!
ঝাণ্ডায় তোমার গৈরিক ফোটে! জয়! জয়!
গান্ধার, ইরাণ, মিস্রাম, মিতান্,
পুত্রের তোমার কীর্তির নিধান,
চীন, শ্যাম, জাপান শিল্পের বিতান! জয়! জয়!

কোনো ভাবসত্যের ভাষারূপ এখানে ধরা পড়ে নি। এ জাতীয় কবিতা তাই যতই শ্রুতিসুখকর হোক, কাব্য-মূল্যের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর।

॥ তিন ॥

সত্যেন্দ্রনাথের মানব-প্রীতিতে খাদ ছিল না। আধুনিক সাম্যতন্ত্রের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জিজ্ঞাসার সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় ছিল না। কিন্তু ঊনবিংশ শতক থেকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এ সমাজের বিবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে আপসহীন সংগ্রাম করেছেন এবং বিংশ শতকেও যে সংগ্রামের তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার সঙ্গে কবির মর্মগত সংযোগ ছিল। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে প্রহসনে সমাজসংস্কার প্রবৃত্তি গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় এ ধারারই অনুস্মৃতি

ঘটেছে। প্রধানত অপমানিত মানুষের লাঞ্ছনায় কবি বেদনাবোধ করেছেন, জাতিভেদের বেড়াজালে জাতীয় সমুন্নতিকে ব্যাহত দেখে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, মধ্যযুগের বিচিত্র কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যঙ্গবাণ উদ্যত হয়েছে।

কবির অতিখ্যাত 'মেথর' কবিতাটি কিন্তু নিস্তরঙ্গ বিবৃতিধর্ম ছাপিয়ে উঠতে পারে নি। ভাষায় চিত্ররূপ নেই, সহানুভূতিদ্রব কবিচিত্ত শব্দকে বিগলিত করতে পারে নি। 'শূদ্র' কবিতায় পৌরাণিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে শ্রমজীবী শূদ্রের মাহাত্ম্য বিতর্কের ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর সনেটে বিতর্ককে আস্বাদে পরিণত করার কবিকৌশল সিদ্ধি পেয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের তর্কে যুক্তি-প্রমাণের সজ্জা আছে, রসের লক্ষ্য সেখানে উপেক্ষিত।

'জাতির পাঁতি' এই ধারার বিশিষ্ট কবিতা। কবিতাটি দীর্ঘ। জাতিভেদ-প্রথার বন্ধন মুক্ত হয়ে মহামানবের মহান্ ঐক্যে জেগে উঠবার আহ্বান এ কবিতায় জানান হয়েছে। কিন্তু কবির বক্তব্যটিও প্রচুর তথ্যের পরিবেশনে একেবারে আবৃত হয়ে পড়েছে। কবি মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত কখনও বাঙালি হিন্দুসমাজের নানা জাতির বিপুল তালিকা হাজির করে কাব্যরসিকের বিরক্তি উৎপাদন করেছেন—

বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর,
পাট্‌নী, কোটাল, কপালী, মালো,
বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর,
তাঁতি, তিলি, মালি সমান ভালো,
বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে,
তামুলী, বারুই তুচ্ছ নয়

মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ,
সকল জগৎ ব্রহ্মময়।

কখনও সুপরিচিত-অপরিচিত পুরাণ-ইতিহাসের নানা কাহিনী-অংশের উল্লেখে কবিতার দেহ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাতেও সৌষ্ঠবহীন তালিকা থেকে রূপময় কাব্যের রাজ্যে উত্তরণ ঘটে নি। অন্যত্র মহামানবের পুজায় নানা জাতির মানুষের কর্মময় ভূমিকার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিসূত্রেও প্রধানত তথ্যপ্রবণতাই প্রকাশ পেয়েছে—

মালাকার তারে মাল্য যোগায়
গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়,
নট তারে তোষে নৃত্যে গানে,

স্বর্ণকারেরা সোনা দিয়ে তাকে ভূষিত করছে, গোয়ালা উপহার দিচ্ছে ননী মাখনের উপচার, তাঁতির বস্ত্র তাকে সজ্জিত করছে, বণিকের প্রচেষ্টা তাকে করে তুলছে ধনবান, যোদ্ধারা তার শক্তির বাহন, বিদ্বান জ্ঞান-অঞ্জনে নিত্য ফোটাচ্ছে তার আঁখিযুগল। উদাহরণের প্রাচুর্য দিয়ে কবি পাঠককে স্বমতে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন। যেখানে শ্বাসরোধকারী তথ্যের সন্নিবেশ নেই সেখানে কবির প্রচারধর্মী উচ্চকণ্ঠ শোনা গিয়েছে।

কবি অন্য যেসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে উত্তেজনা অনুভব করেছেন তার মধ্যে গোঁড়ামি অন্যতম। 'টিকিমঙ্গল' প্রভৃতি কবিতায় কবির কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর বেজেছে। রচনা হিসেবে সেগুলি সার্থকতর। রঙ্গজড়িত তীব্র ব্যঙ্গরস সৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন। তবে গুরুগম্ভীর রসের সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি বালসুলভ উত্তেজনাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে যে শাস্ত্রশাসন তর্জনী তোলে মধ্যযুগীয় সেই মনোভাবের বিরুদ্ধে

'বন্দরে' কবিতায় ধিক্কার দিয়েছেন। এই ধিক্কার সবল হলেও কাব্যরসপুষ্ট নয়।

॥ চার ॥

বহুসংখ্যক কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের স্বাধীনতাপ্রীতি ঘোষিত হয়েছে। কোনো কোনো কবিতায় পরাধীনতার জ্বালা ও স্বাধীনতালাভের তীব্র কামনা প্রকাশ পেয়েছে, কোথাও পৌরাণিক কাহিনী বা চরিত্রের নব ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে কবি তাঁর মনোভাবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কোথাও প্রকৃতি-বস্তুর বর্ণনার মধ্যে তাঁর আদর্শটির আরোপ করেছেন, কখনও দেশপ্রেমিক মনীষী-বন্দনার আশ্রয় তাঁকে নিতে হয়েছে। এ ধারার বিশিষ্ট কবিতাগুলির সংখ্যার বহুলতায় বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। 'চরকার গান', 'চরকার আরতি', 'সন্ধিক্ষণ', 'আখেরী', 'জাগৃহী', 'নির্জলা একাদশী', 'ইজ্জতের জন্য', 'মৃত্যুস্বয়ম্বর', 'কাঠগড়া', 'সাল তামামী', 'ফরিয়াদ', 'কুলাচার', 'ঝোড়ো হাওয়া', 'ব্রজকামনা', 'পাগলা ঝোরা', 'জন্মাষ্টমী', 'ছেলের দল', 'কয়াধু', 'অরুন্ধতী', 'ভীমজননী', এবং আরও বহু কবিতাকেই এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। এ ছাড়া, মনীষীদের গৌরবকথা প্রসঙ্গেও কবির মনের এই স্বাজাত্যবোধের সুরটিই বেশি উৎসাহ প্রকাশ করেছে। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

'সন্ধিক্ষণ' কবিতাটি ১৯০৪ সালের উত্তেজনাকালীন সৃষ্টি। রচনা হিসেবে এটি সর্বাপেক্ষা অপরিণত। অতি প্রকট প্রচারভঙ্গি, গদ্যাত্মক ভাষা ও শব্দ-যোজনা রীতি, কবিচিত্তের নিরুত্তাপ ও উত্তেজনাহীন দূরত্ব এ কবিতাকে ন্যূনতম প্রাণচাঞ্চল্যেও তরঙ্গিত করে নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হেমচন্দ্রপ্রমুখ কবির স্বদেশ-

চেতনামূলক কবিতার ভাবনা ও রচনা-রীতির সীমা লঙ্ঘন করতে পারেন নি কবি। বরং প্রচারের তীব্র বাসনা থাকা সত্ত্বেও কবিকণ্ঠের উত্তেজনার অভাব রচনাটিকে একান্তই কৃত্রিম করে তুলেছে।

গান্ধীজীর প্রতি ভক্তি সত্যেন্দ্রনাথকে চরকার দিকেআকর্ষণ করেছে। 'চরকার গানে'ও বিষয় অপ্রধান হয়েছে। ছন্দ লঘু সুরের চর্চা করেছে। কবি এখানে নিশ্চিতভাবেই বিষয়কে এড়িয়ে গিয়েছেন। 'চরকার আরতি'তেও সুরে গাম্ভীর্য আসে নি, বরং দেশ-বিদেশের প্রচুর তথ্যের আমদানী ঘটায় 'fancy'র বিশিষ্ট আস্বাদ থেকেও কবিতাটি বঞ্চিত হয়েছে। চরকার সঙ্গে জড়িত গান্ধী-পরিকল্পিত বিশিষ্ট অর্থ-নৈতিক প্রশ্ন ও জীবনাদর্শ কবিকে স্পর্শ-মাত্র করতে পারে নি।

কবি জটিল প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত হন নি, তবে যেখানেই তথ্যরাজ্যে প্রবেশের নির্বাধ সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই তাঁর উৎসাহ চরমে উঠেছে। 'আখেরী' কবিতায় কংস, জরাসন্ধ, রাবণ, মিহিরকুল থেকে শুরু করে বার্ক, সেরিডন, ইম্পে, ক্লাইভ, ক্যানিং, ডায়ার অনেকেই স্থান করে নিয়েছে। ইতিহাসের পথ ধরে অক্লান্ত চরণে কবি অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু শতাধিক পংক্তির এই দীর্ঘ কবিতায় এমন একটি শব্দচিত্র বা ইতিহাস ও পুরাণগর্ভ ভাবপরিবেশ রচিত হয় নি যার মধ্য দিয়ে অন্তরের তীব্র ঘৃণা বা ক্রোধ, প্রত্যয় বা ভবিষ্যতের আশা রূপে ধরা দিতে পারে। 'ফরিয়াদ' কবিতার বিষয়বস্তু এতটা উত্তেজক যে কবির ভাষায় উত্তেজনাহীন ঘটনাবিবরণ দেখে অবাক হতে হয়। নিজের ক্ষোভ ঘৃণা মাঝে মাঝে অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তা নেহাৎই সংবাদের আকারে। কবির কাছ থেকে তাঁর মনোভাবের সংবাদ রসিক পাঠক চায় না, সেই ঘৃণা ও ক্রোধের রঙে আঁকা শব্দচিত্র

অন্তরতটে তরঙ্গ তোলে কিনা তাই এক্ষেত্রে বিচার্য। কখনও ঈষৎ ব্যঙ্গের সুর বক্রতা এনেছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে কবিতাটি আস্বাদহীন। এমন কি গভীর হৃদয়-আন্দোলন যেখানে প্রত্যাশিত সেখানেও কবির চাপাকণ্ঠ বিবৃতিধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। 'সালতামামী' কবিতায় 'সর্পজিহ্ব সুসভ্য শয়তানী', বা

কালপেঁচা ওই বল্‌ছে বিকট ডেকে ;

কেঁপে কেঁপে উঠছে আকাশ, কল্‌জে চেপে ধবছে থেকে থেকে। এমনি দু-একটি ভাবরঞ্জিত চিত্রকল্প বা 'রুদ্ররূপী রোদনে'র কল্পনা লঘুপ্রাণ সাংবাদিকতার উপরে বিপদঘন দুর্দিনের ভার চাপিয়ে দিয়েছে। অবশ্য ষাট পংক্তির দীর্ঘ কবিতার অনিবার্য বিফলতা এর দ্বারা ঠেকান যায় নি।

'ইজ্জতের জন্য' নামক কবিতায় দক্ষিণ আফ্রিকায় মানবিক অধিকারের জন্য ভারতবাসীর সংগ্রামের এক দীর্ঘ ছন্দোবদ্ধ বিবরণ কবি দান করেছেন। অন্যান্য কবিতার মত এখানেও বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে, অতিকথন প্রশ্রয় পেয়েছে, কবি হৃদয়ে উত্তেজনা বোধ করলেও ভাষায় বা চিত্রে তাকে ধরে রাখতে পারেন নি। উদ্দেশ্য-মূলকতা অতিপ্রকট হয়ে উঠেছে।

'ঝড়ো হাওয়া'য় রবীন্দ্রসুরটির অনুসরণ শুনি। কবিতাটিতে সাধারণভাবে যুগ-পরিবর্তনকালীন ধ্বংসোন্মত্ততার সাড়া জেগেছে। ভবিষ্যতের শান্তিস্বপ্নও প্রকাশ পেয়েছে, তাতে প্রত্যয়ের দৃঢ়তাও আছে, আন্তরিকতারও অভাব নেই—

ঝড়ের তালে নাচবে ধূলি উড়িয়ে ধূসর কেশ।
রুদ্রজটা পড়বে ছিঁড়ে—জুড়িয়ে যাবে দেশ।
স্বর্গ হতে গঙ্গা ঝরে
দিবে ভুবন স্নিগ্ধ করে ;

কুম্ভীরের ওই জিহ্বা-তালুর ঘুচবে পিঙ্গবেশ।

রবীন্দ্রনাথের "বর্ষশেষ" প্রভৃতি কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব এখানে অনুভব করা যায়। এর সঙ্গে মিলিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের 'বজ্রকামনা' কবিতাটিও পঠিতব্য। এ কবিতায় রুদ্ররূপী বজ্রের আগমনে সুনিবিড় বর্ষণ সম্ভাবনার জন্য বন্ধ্যা ধরণীর প্রতীক্ষার চিত্র এঁকেছেন কবি—

ওগো বজ্রের রাজা অস্ত্র তোমার
হান একবার বেগে,—
এই ক্ষীণ বাষ্পের দীন উচ্ছ্বাস
পরিণত হোক্ মেঘে,
ওগো ঘনায়ে মিলায়ে কর সুনিবিড়
তড়িত জড়িত স্বরে,
আজ বধ-ভয় ভুলি বন্ধ্যা ধরণী
বজ্র কামনা করে।

এই দুটি কবিতায়ই কবির রূপরচনা তুলনামূলকভাবে অনেক কাব্যিক। এখানে বিবৃতি নেই, চিত্রসৃষ্টি আছে, সে চিত্রে বস্তুর রঙের সঙ্গে কবিচেতনার ভাববোধের তীব্রতাও বিজড়িত হয়ে গিয়েছে। তথ্যপ্রাচুর্য বা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রচারবাসনা এখানে স্থান পায় নি। তবে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষে' বা অন্যত্র যে ব্যক্তিগত আর্তনাদ নূতনকে বরণ করবার সঙ্গে বিজড়িত, যে দুঃখ তপস্যার দার্শনিকতা উপলব্ধিতে মূর্ত তা সত্যেন্দ্রনাথে নেই। সত্যেন্দ্রনাথের এই ভাবানুভূতির পশ্চাৎপটে রয়েছে রাজনৈতিক মুক্তির বাসনা, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কিন্তু বস্তু না রেখে তার নির্যাসমাত্র গ্রহণ করায় রবীন্দ্রকবিতার ভাব-সামীপ্য এখানে অনুভব করা যায়। এই abstraction বা

বস্তুছাঁকা ভাবনির্যাস 'জাগৃহি' কবিতাকে তথ্যপ্রাণ কবিতাগুলির তুলনায় সাফল্য দিয়েছে। নূতনকে আহ্বান করেছেন কবি, পৌরাণিক দু-একটি ইঙ্গিত চিত্রকল্পরচনায় আত্মস্থ হয়েছে, ভার হয়ে কবিতার প্রাণকে আবৃত করে নি—

পুরাতনের স্তম্ভ চিরে বাইরে এস সিংহতেজে,
জাগ জড়ের সুপ্ত জীবন গোপন শিখায় নয়ন মেজে ;
অবিশ্বাসের হোক্ অবসান, তুমিই তাহার নিশ্বাস রোধ ;
অন্তরে হও আবির্ভূত হে আত্মদ ! বলপ্রদ !

'বন মানুষের হাড়' কবিতাটির যৌবন-উত্তেজনাও প্রত্যক্ষ ঘটনা-সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় কতকটা কাব্যসার্থকতা লাভ করেছে। এসব কবিতার ভিত্তিতে যে কবির তীব্র স্বাজাত্যবোধ রয়েছে এদের বস্তুবিশ্লিষ্ট রূপসত্ত্বেও তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'পাগলা ঝোরা' কবিতাটি ঠিক রূপক নয়। মানবের হাতে বন্দী এক পাহাড়ী ঝরনার আর্তির মধ্যে ধরা পড়েছে পরাধীন জাতির মুক্তির কামনা। বলা উচিত নিসর্গচিত্র হিসেবে ঝরনার উদ্দাম যৌবনের মুক্তগতি ও আনন্দ-চাঞ্চল্য কবিতার প্রথম স্তবকগুলিতে চমৎকার রূপ পেয়েছে, শেষ দিকে বন্দী ঝরনার বেদনা হয়েছে প্রকাশিত—

আগে আমায় চিনত যারা, বলছে শোনো,—'যায় না চেনা !'
বাজবে কবে প্রলয়-বিষাণ ?—মুখে আমার উঠছে ফেনা !
বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাকবে আরো ?
রুদ্রতালে নাচব কবে ? তোমরা কেহ বলতে পার ?

নিসর্গচিত্ররূপে এর বাধা নেই কোথাও, কিন্তু এর মধ্যে জাতীয় জীবনের মুক্তিবাসনা ব্যঞ্জিত হয়েছে।

কবির পুরাণচেতনা বহুল তথ্যের রূপ ধরে নানা কবিতায় দেখা

দিয়েছে। তবে বিশেষ করে কতকগুলি কবিতায় পুরাণকাহিনীর নব ব্যাখ্যান স্থান পেয়েছে। এই ব্যাখ্যা সাধারণত স্বাধীনতার কামনা ও ভবিষ্যতের কল্যাণ-স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত। 'গিরিরাণী', 'কয়াধু', 'অরুন্ধতী', 'ভীমজননী', 'জন্মাষ্টমী' প্রভৃতি কবিতার নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রকে নব ভাবনায় রঞ্জিত করবার একটি ধারা বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদনের কাল থেকে চলে আসছে। এ বিষয়ে কবির সাফল্য কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভর করে—

এক। পুরাণকাহিনীর সঙ্গে যে ভাবপরিবেশ স্বাভাবিকভাবে বিজড়িত তার পরিমণ্ডল থেকে কবিতাকে মুক্ত করতে হবে যে নূতন ব্যাখ্যানটি কবি যুক্ত করতে চান তা বিশ্বাসযোগ্য হওয়া উচিত। নব ব্যাখ্যাটি যেন আরোপ বলে মনে না হয়, পুরাণকাহিনীর সঙ্গে এর সম্পর্কটি যেন সহজ ও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

দুই। কবিকল্পিত নব ব্যাখ্যাটি একটা সাধারণ সত্য না হয়ে যেন বিশিষ্ট ব্যক্তিক-সত্য হয়ে ওঠে। কবির উপলব্ধি যেন তার সর্বদেহে একটি ব্যক্তিত্বের স্পর্শ এনে দেয়। যুগচেতনার নিকট থেকে শুধু ঋণরূপেই যেন তাকে গ্রহণ না করা হয়। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে রামায়ণের কাহিনী ও চরিত্রগুলি নবরূপে দেখা দিয়েছে। এই নবরূপের চেতনা-উৎসে যুগের প্রভাব আছে, কিন্তু মধুসূদনের ব্যক্তিভাবনার রঙে তারা আত্যন্ত নবীন। রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' প্রভৃতি কাব্যনাট্যে কবির ব্যক্তিবোধ নবীনতা সম্পাদনের ভিত্তি।

সত্যেন্দ্রনাথ পুরাণকাহিনীর যে নূতন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন তার সঙ্গে কবির রাজনৈতিক বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই

রাজনৈতিক বিশ্বাসে সর্বসাধারণের অধিকার, কবির ব্যক্তি-বেদনার মুদ্রণ এর উপরে পড়ে নি।

'গিরিরাণী' কবিতায় হিমালয় পর্বত ও মেনকার কন্যা পার্বতী দুর্গার পিতৃগৃহে আগমনের কাহিনীর পটভূমিটি গৃহীত হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে কন্যার আগমনে আগমনীর আনন্দসঙ্গীত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কবি এই প্রচলিত সুরের রেশটি স্তব্ধ করে হিমালয়পুত্র মৈনাকের দেব-বিদ্রোহ এবং ছিন্নপক্ষ সমুদ্র-আশ্রয়কে কেন্দ্র করে মেনকার শোককে প্রধান করে তুলেছেন। মৈনাকের এই আচরণের মধ্যে স্বরাজসাধক দুঃখব্রতীকে আবিষ্কার করেছেন। কবিতাটির অতি দৈর্ঘ্য, এবং গভীর আবেগাকুতির অভাব একে আবেদনশীল করে তুলতে পারে নি। এ কবিতার প্রধান ত্রুটি এর অতিপ্রকট আরোপধর্ম। অবলম্বিত পৌরাণিক বিষয়টির সঙ্গে নব স্বাদেশিক ভাবনার কোন অচ্ছেদ্য সম্পর্কই স্থাপন করা যায় নি। কবির নব উপলব্ধি এতটা বিশ্বাসযোগ্য ও অনিবার্য হয়ে ওঠে নি যাতে আগমনী গানপ্রসঙ্গে অনুভূত পাঠকচিত্তের যুগসঞ্চিত রসবোধকে স্থানচ্যুত করতে পারে। পুরাতনের স্থানচ্যুতি এখানে ঠিকই ঘটেছে, কিন্তু নবীনের প্রতিষ্ঠা হয় নি। তাই একটা ভগ্নপ্রায় পুরাতন কল্পনা এ কবিতায় আমাদের ব্যথিত করে, রূপসিদ্ধ নব ভাবনা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে না।

'কয়াধু' কবিতায় প্রহ্লাদের মধ্যে আদর্শ মানুষকে খুঁজেছেন কবি। পাপিষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর সর্ববিধ অত্যাচার নীরবে সহ্য করেও প্রহ্লাদ সত্যের প্রতি যে অবিচল নিষ্ঠা দেখিয়েছে স্বরাজ-আন্দোলনের সঙ্গে কবির মন তাকে সহজেই যুক্ত করেছে। হিরণ্যকশিপুর দণ্ডদানের নিষ্ঠুরতা শাসক শ্রেণীর ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রূপেই উপস্থিত হয়েছে কবির কাছে। কিন্তু প্রহ্লাদ-জননী কয়াধুর

জবানীতে নিস্তরঙ্গ বিবরণসর্বস্বতা কবিতার যাবতীয় আবেদনকে বিনষ্ট করেছে। নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিতে প্রহ্লাদের হত্যার চেষ্টাও মাতা কয়াধুর সমতল ভাষাকে তরঙ্গক্ষুব্ধ করে নি—

পাহাড় থেকে আছড়ে ফেলে দিচ্ছে পাথরে—
প্রহ্লাদে মোর ; দিচ্ছে ঠেলে সাপের চাতরে।
জগদ্দলন পাষাণ বুকে ফেলছে তরঙ্গে
চোরের সাজা সাজিয়ে সাজা চোরেরি সঙ্গে।...
কভু দেখি ফেলছে বাছায় পাগলা হাতীর পায়,
বিদ্রোহীদের প্রাপ্য সে আজ নিরীহজন পায় !

তা ছাড়া কবিতাটির অতি দৈর্ঘ্য নানা ঘটনার বিবরণে কণ্টকিত। এ কবিতায়ও ব্যর্থতা তাই সর্বাঙ্গীন।

'অরুন্ধতী' কবিতায় কল্মাষপাদ কর্তৃক নিহত পুত্রের অজাত সন্তান পাপ ও অন্যায়ধ্বংসী শক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ভীমজননী' কবিতায় একচক্র গ্রামে বক রাক্ষসের বিরুদ্ধে ভীমকে প্রেরণ করে জননী কুন্তী মানবমহিমা উপলব্ধি করেছেন। কুন্তীর মধ্যে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান জাতীয় বীরের জননীর গর্বের ছবি সত্যেন্দ্রনাথ এঁকেছেন। বিবরণ-প্রাধান্য, আবেগ-কম্পনের অভাব, নাটকীয়মুহূর্তকে ভাষারূপে ধরে রাখার ব্যর্থতায় এ কবিতা দুটিও সফল হয় নি।

এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'মহাভারতী' কাব্যগ্রন্থের কথা মনে আসে। উক্ত গ্রন্থে যতীন্দ্রমোহন মহাভারতের কয়েকটি চরিত্রকে নব মানবমূল্যে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ভাষার নাট্যরস ও গাম্ভীর্য এবং কোনো বিশিষ্ট আদর্শবাদ থেকে কল্পনাকে মুক্ত রেখে তিনি অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের সে সাফল্যলাভ ঘটে নি।

অবশ্য তাঁর 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটি পূর্বোল্লিখিত কবিতাগুলির বৈফল্য বহন করে না। এখানে আরোপধর্ম প্রকট নয়। কৃষ্ণ-জন্মের সঙ্গে শাসন-শোষণ বিক্ষত সমাজে ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের কল্পনাটি সহজ সাযুজ্য লাভ করেছে। গীতার 'সম্ভবামি' বাণী দীর্ঘকাল ধরে এ দেশীয় পাঠকচিত্তকে যে বিশ্বাসে ধরে রেখেছে তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এ রচনার ভাবকল্পনায় কোন বিস্ময়কর মৌলিকতা চোখে পড়ে না। কিন্তু কবিতাটি রূপনির্মিতিতে সিদ্ধিলাভ করেছে। শব্দচয়নে গাম্ভীর্য, সর্ববিধ তাবল্যহীনতা, নিগূঢ় সংহতি, এবং বিকল্প পংক্তিতে অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহার করায় আঠারো মাত্রার চরণে আরও দৈর্ঘ্যের বিভ্রম সৃষ্টি কবিতাটির আবেদনকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। কবি অবশ্য কংসজয়ী কৃষ্ণকে একটি স্তবকে যমুনাতীরে মুরলীধারী রূপেও দেখেছেন। কিন্তু তাতে ভাবগত ঐক্যের হানি ঘটে নি। কৃষ্ণকে তিনি "জরাভরা ভারতের চিত্তবাসী চির তরুণতা"-রূপে অনুভব করেছেন, পাপীর বিনাশে এবং প্রেমের মাধুর্যে তার প্রকাশ সমভাবেই ঘটেছে।

'বড়দিনে' যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে লেখা। 'সেবাসাম্য', 'ধর্ম-বোধন' প্রভৃতি কবিতায়ও বিশ্বমানবের মহান ঐক্যের আদর্শ প্রচার করেছেন কবি। 'বুদ্ধ পূর্ণিমা' কবিতায়ও এই একই ভাব প্রকাশিত। কিন্তু কবিতা হিসেবে বুদ্ধ পূর্ণিমার সাফল্য এরা লাভ করে নি। অপরাপর বহু কবিতার মত তথ্যের প্রাচুর্য এবং প্রচার-ধর্মের প্রাধান্য এদের ব্যর্থ করে দিয়েছে। বড়দিনেতে এই তথ্য-বিলাস চরমে উঠেছে। প্রাচীন যাবতীয় সভ্যতার নামের তালিকা দিয়েছেন কবি। তবে মাঝে মাঝে দু-একটি বিস্ময়কর ভাষাচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন হিস্পানীয় সভ্যতার ভগ্নাবশেষ দর্পের

বর্ণনায় কবি বলেছেন, 'ঝাঁজরা জাহাজ তিমির পাঁজর হেন,' আর সাধারণভাবে একটি উপমায় এই প্রাণহীন অহঙ্কারী সভ্যতার কথা বলেছেন—

হারিয়ে গতি ধাবনব্রতী ময়দানবের সিন্ধুচারী ঘোড়া
বাড়ব শিখায় নিশাস ফেলে চুপে।

সত্যেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতায় ভাবোপলব্ধির বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভাব, ভাষাচিত্র অপেক্ষা বিবৃতি-বক্তৃতার আধিক্য, তথ্যপুঞ্জের অতিরেক, কবির উত্তেজনাহীন তটস্থ দর্শকের ভূমিকা-গ্রহণ সাধারণভাবে ব্যর্থতার কারণ হয়েছে। কবির এই জাতীয় কবিতা তাঁর অপর একটি বিশেষ মানসপ্রবণতার পরিচয় দেয়। তাঁর কল্পনায় মৌলিকতা বা জটিল গভীরতার চিহ্ন বড় নেই। ভাবগম্ভীর কবিতায় লঘু কল্পনা অনেক সময়ে রসের আবেদনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। আসলে সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনায় দূরস্পর্শী কোনো অনুভূতি প্রায়ই প্রকাশ পায় নি। বস্তুর প্রত্যক্ষ রূপে তিনি মুগ্ধ, বিশিষ্ট ভাবাদর্শ প্রচারের বাহন হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে কবির দ্বিধা নেই। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ আবিষ্কারে তীক্ষ্ণ কবিদৃষ্টির রয়েছে অভাব, এবং রহস্যস্পর্শী রোমান্টিক কল্পনার সাক্ষাৎও বড় মেলে না।

॥ পাঁচ ॥

মনীষীবন্দনামূলক কবিতার আদর্শ নির্ণয় করা দুরূহ নয়। এ জাতীয় কবিতায় আমরা আলোচ্য ব্যক্তির জীবনের তথ্যপরিচিতির জন্য অপেক্ষা করি না। কবিচিত্তে কোন মনীষীর মাহাত্ম্য বিশিষ্ট আবেগঘন অন্তপ্রেরণার সৃষ্টি করতে পারে। তাতে সর্বদা

উক্ত মনীষীর পূর্ণ গৌরব বা ব্যক্তিপরিচয় যদি প্রকাশ নাও পায়, সমালোচনা করবার কিছু নেই। সেই মনীষী সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আমরা সে কবিতা পড়ব না। পাঠকের জ্ঞান-বৃদ্ধি কোনো জাতের কবিতারই যে উদ্দেশ্য হতে পারে না এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে কাব্যবিচারে অগ্রসর হতে হবে। কবির সেই বিশিষ্ট উপলব্ধিতে যদি কোন মনীষীর সত্যপরিচয় ধরা না পড়ে ক্ষতি নেই, কিন্তু কবির ব্যক্তিচেতনার অনন্যতার স্বাক্ষর না পাওয়া গেলে রচনা হিসেবে তার অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণিত হয়। জয়দেব সম্পর্কে লেখা এক সনেটে মধুসূদন তাঁকে স্বয়ং মাধব বলে কল্পনা করেছেন, তাঁর পদাবলীর প্রেমব্যাকুল সুরে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর রব শুনতে পেয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী ঐ একই বিষয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক মনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। জয়দেবের মধুর রসে কামচাতুর্য দেখেছেন এবং আদিরসের অতি চর্চায় বাঙালির পৌরুষচ্যুতির লাঞ্ছনায় বেদনাবোধ করেছেন। সম্ভবত এর কোনো কবিতায়ই জয়দেবের পূর্ণ পরিচয় নেই। কালিদাস রায় কুমুদরঞ্জনের ন্যায় ভক্তিপ্রাণ কবি তাঁর হরিস্মরণসবস মনের দিকেই নিশ্চয়ই প্রণতি জানাতেন। জয়দেবের বস্তুনিষ্ঠ সত্যপরিচয় নিয়ে বিব্রত হওয়া এক্ষেত্রে অনাবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন কবির নিজস্ব উপলব্ধির গাঢ়তা এবং প্রকাশভঙ্গিতে ভাষারূপসিদ্ধিই এদের উৎকর্ষের প্রকৃত পরিমাপ। এই কবিতাগুলিতে জয়দেব যতটা ধরা দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি ধরা পড়েছেন মধুসূদন বা প্রমথ চৌধুরী। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সত্যেন্দ্রনাথ বিষয়ক কবিতাটি একটি চরম নিদর্শন। সত্যেন্দ্রনাথ এখানে উপলক্ষমাত্র। তাঁর বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক। আসলে অনুজকল্প কবি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর দর্পণে বৃদ্ধ মহাকবি আপন আসন্ন

মৃত্যুকে দেখেছেন। সেই মৃত্যুবোধ এবং মৃত্যুর মুখে দাঁড়ানো জীবনপ্রীতিই এই কবিতায় প্রকাশিত। অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ মনীষী নন। যেখানে সাধারণ স্তরের কোন ব্যক্তি মনীষার ছাড়পত্র ছাড়াই, কবির ব্যক্তিগত কোনরূপ হৃদয়-সম্পর্কের পথ ধরে কবিতার বিষয়ে উন্নীত হয়, সেখানে আলোচ্য ব্যক্তির সত্যপরিচয় প্রকাশের প্রশ্নই ওঠে না, অন্য যে কোনো বিষয়ের কবিতা থেকে এদের কোনো বিশেষ ধরনের পার্থক্যের দিকে চোখ রেখে সমালোচককে এগুতে হয় না।

সত্যেন্দ্রনাথের মনীষীবন্দনামূলক কবিতার সংখ্যা অল্প নয়। এ জাতীয় কবিতারচনায় কবির বিশেষ প্রবণতা ছিল সংখ্যার বিপুলতা তা প্রমাণ করে। 'বুদ্ধবরণ', 'পরিব্রাজক', 'মহানামন্' 'বুদ্ধপূর্ণিমা', 'ঘুমগুম্ফা'য় বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়েছে। 'সাগরতর্পণ'-এ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'মনীষীমঙ্গল'-এ, জগদীশচন্দ্র বসু এবং 'অর্ঘপঞ্চক'-এ কৃত্তিবাসের গৌরব কীর্তিত হয়েছে। 'রাজর্ষি রামমোহন', 'মহাকবি মধুসূদন', 'কালীপ্রসন্ন সিংহ', 'টিকিমেধ যজ্ঞ' (এটিও কালীপ্রসন্ন-সম্পর্কিত), 'দীনবন্ধু মিত্র', 'শতবার্ষিকী' (প্যারীচাঁদ মিত্র), '১৪ই জ্যৈষ্ঠ' (অক্ষয়কুমার দত্ত), 'হেমচন্দ্র', 'দেশবন্ধু' (রমেশচন্দ্র দত্ত) কবিতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগৃতির প্রধান পুরুষদের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। 'গান্ধীজী', 'গোখলে'-র মত দু-একটি ক্ষেত্রে মাত্র তিনি বঙ্গদেশের সীমানা অতিক্রম করেছেন। গোবিন্দদাস, দ্বিজেন্দ্রলাল, হরিনাথ দে, নফর কুণ্ডু প্রভৃতির মৃত্যু উপলক্ষে লেখা যথাক্রমে 'কবি তিরোধান', 'তান্‌কা সপ্তক', 'আচার্য হরিনাথ দে', 'নফর কুণ্ডু' উল্লেখযোগ্য। 'ঋষি টলস্টয়', উইলিয়াম স্টেড ('বিশ্ববন্ধু'),

'নিবেদিতা', ম্যাকস্থইনি ('ইচ্ছামুক্তি') কবিতায় তিনি বিদেশী মনীষীদের কথা বলেছেন। সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রস্থন্দর ('আচার্য ত্রিবেদী') তাঁকে কবিতারচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। তবে কবির সমস্ত অন্তর রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্যকীর্তনে সদাজাগ্রত তৎপরতা দেখিয়েছে। রবীন্দ্রবিষয়ক বহুসংখ্যক কবিতার মধ্যে 'নমস্কার', 'আভ্যুদয়িক', 'নমস্কার' (২নং), 'শ্রদ্ধাহোম', 'দিগ্বিজয়ী', 'জ্যোতির্মণ্ডল', 'অর্ঘ্য', 'কবি-জুবিলি', 'কবি-প্রশস্তি' প্রভৃতি প্রধান।

(বুদ্ধদেবের মৈত্রীমন্ত্রে সত্যেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল। বিশ্বমানবের মৈত্রী. অহিংসা এবং করুণার মহাগুরু বুদ্ধদেবকে আপনচিত্তের অকৃপণ ভক্তি নিবেদন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার আদর্শ, এবং বুদ্ধদেবের সাধনার প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ দুঃখের সাধনাজাত মহৎ সত্যের উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করেছেন বুদ্ধদেবকে। সে গভীরতা সত্যেন্দ্রনাথে নেই। নানা কাহিনীমূলক রচনায় সেবা-প্রীতি-করুণা-কোমলতায় যে বুদ্ধবিগ্রহ রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছেন তার পূর্ণতাও অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথে প্রাপ্তব্য নয়। 'ধূমগুম্ফা'য় তিনি ছন্দচাতুর্যে মুগ্ধ, ফরমায়েসী কবিতা 'বুদ্ধবরণে' তিনি তথ্যচয়নে আগ্রহান্বিত। কিন্তু 'বুদ্ধপূর্ণিমা'য় কবিতার সর্বাঙ্গে একটি শুচিস্নাত শুভ্রতা অনুভব করা যায়। ব্যথিত বিশ্বের ক্রন্দন যে কবিকেও কিছুটা স্পর্শ করেছে কবিতাটিতে তার প্রমাণ আছে। কবিতাটিতে বুদ্ধদেবের এমন একটি ভাবমূর্তির আভাস আছে, ছন্দের ভঙ্গিতে এমন বিগলিত স্থর স্পন্দিত হয়েছে যাতে কবির বাণীটি কাব্যসফল ভাষারূপ লাভ করেছে—

নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ
ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পায়
হে বোধিসত্ত্ব হে ! মাগিছে মর্ত্ত্য যে
ও পদপঙ্কজে শরণ পুনরায়। ...
জগত ব্যথা-ভরে জাগিছে জোড়-করে
এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান,
এস হে এস শ্রেয় ! এস হে মৈত্রেয় !
ক্রূরতা মূঢ়তার কর হে অবসান ॥

কবিতাটির সাফল্য স্বীকার্য ; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কবি-কল্পনায় নেই সেই মৌলিক সাহস মোহিতলালের 'বুদ্ধ' কবিতাটি যাতে প্রোজ্জ্বল। মোহিতলাল বুদ্ধের প্রবৃত্তি সংহার মন্ত্রকে মানবের হৃদয়-উৎসাদনের অস্ত্র বলে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন—

বোধিদ্রুমমূলে বসি যেই স্বপ্ন দেখিলে, সন্ন্যাসী,
তোমারি সে,—সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তুমি দ্রষ্টা তার ;
বিশ্বজনে সেই স্বপ্ন দেখাবার করিলে প্রয়াস—
রুদ্ধ করি আঁখিজল ম্লান করি অধরের হাসি।
প্রাণহত্যা করিবার কেবা তোমা দিল অধিকার ?—
তার চেয়ে ক্রূর সে কি তৈমুরের লক্ষজীব-নাশ ?

মোহিতলালের জ্ঞানচর্চা মননগভীরতায় ভাস্বর, সেই মননের উৎসে এই ভাব-ভাবনাজড়িত একান্ত মৌলিকতার জন্ম। সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানসাধনা তথ্যসঞ্চয়ে দিশাহারা ও মুগ্ধ। এই অভিনবত্ব তাঁর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত।)

বহু ভাষাবিদ্ জ্ঞানসিদ্ধ 'হরিনাথ দে'র মৃত্যুতে কবি শিশুসুলভ তথ্যনিষ্ঠ অর্ধকান্না-রসে ডুব দিয়ে বলেছেন 'যাচ্ছে পুড়ে নূতন করে

সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা,' পরহিতব্রতী 'নফর কুণ্ডু'-এর আত্মদানে কবির উত্তেজনাও বয়স্কের পরিণত মনের নৈকট্য পায় নি—

নফর নফর নয়,—একমাত্র সেই তো মনিব
নফরের দুনিয়ায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে গিয়ে কবি 'তান্‌কা সপ্তক'-এর ছন্দ-চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছেন, অবশ্য তাঁর পরুষ হাস্য-স্ফুরিত ব্যক্তিত্বের সামান্য ইঙ্গিত এর মধ্যে থেকে উঁকি দিয়েছে। স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের দেহান্তে লেখা 'কবির তিরোধান' কবিতায়ও প্রকৃত কাব্যিক অনুপ্রেরণার চিহ্নমাত্র নেই। এই সব কবিতা ফরমায়েসী রচনা, কোনো না কোনো সামাজিক ঘটনায় সাড়া দিয়ে লেখা। এদের মধ্য দিয়ে কোন্ কোন্ বিশেষ গুণী ব্যক্তির প্রতি কবির মনের বিশেষ আকর্ষণ তা বুঝবার উপায় নেই, কাব্যোৎকর্ষের দিক থেকেও এরা একান্তভাবেই মূল্যহীন।

কৃত্তিবাসের স্মৃতিপূজা উপলক্ষে কবি পাঁচটি কবিতার এক 'অর্ঘ্যপঞ্চক' রচনা করে নিবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে 'বঙ্গ-বাল্মীকি' নামে প্রথম কবিতায় সনেটপ্রায় আঙ্গিকে কৃত্তিবাসের বাঙালি চরিত্রের যে পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে তা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। বাকি চারিটি কবিতা মামুলী। যে সব কারণে সত্যেন্দ্র-নাথের অনেক কবিতা কাব্যসার্থকতা বঞ্চিত এখানেও তাদেরই পুনরাবৃত্তি।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশের চিন্তাজগতে আকাশস্পর্শী-গৌরব নিয়ে এসেছিল। সত্যেন্দ্রনাথের কবিস্বভাব বিংশ শতকের প্রথমভাগে পূর্ণতা পেলেও জীবনের প্রথম আঠারো বছর তিনি উনিশ শতকের কালসীমায় কাটিয়েছেন। ঐ শতাব্দীর

গৌরব-কালের উত্তপ্ত স্মৃতি তখনও বিলুপ্ত হয় নি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মধুসূদন, রমেশচন্দ্র দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অনেকের বিষয়েই তিনি কবিতা লিখেছেন। এঁদের অনেকে নবজাগৃতির রথকে কর্মক্ষমতা দ্বারা পরিচালিত করেছে, এবং এঁরা সবাই নব্য বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ্য পুরুষ। এঁরা ভিন্ন মেজাজের এবং বিচিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কবির নির্বাচন দেখে কবিপ্রাণের বিশিষ্ট প্রবণতা বুঝবার কোনো উপায় নেই। এদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের শতবার্ষিকী উৎসবে রচিত সনেটটিতে বাংলা গদ্যের সহজরূপের আহ্বায়ক হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন—

সোজাসুজি শাঁখা শাড়ী সিঁদুরে কাজলে
সাজালে হে স্বদেশের সরস্বতীটিরে,
বিনা আড়ম্বরে আহা নিজ বুক চিরে
আলতা পরালে দুটি চরণ কমলে।

সে রূপচেতনায় অভিনবত্ব না থাকলেও বিবৃতির সামান্যতায় তা পর্যবসিত হয় নি; বহু তথ্যের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হয় নি। কবিতার সনেটদেহ কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত থাকতে কবিকে বাধ্য করেছে। মধুসূদনবিষয়ক সনেটেও একাগ্র বোধের সংহত বাণীরূপ ধরা পড়েছে। কবির ইতিহাসচেতনা এবং যৌবনশক্তির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা কবিবিদ্রোহী মধুসূদনের এক দৃঢ়প্রাণ ভাবমূর্তি অঙ্কিত করেছে মাত্র কয়েকটি পংক্তিতে—

প্রবল জীবন-বেগ জাতির জীবনে
মূর্ত তুমি মহাসত্ত্ব! ওগো মহাবল
দীপ্ত শিখা তুমি সুপ্ত আগ্নেয় পর্বতে,
অরুণ সারথি তুমি আলোকের রথে।

উপমাত্মক এই চিত্রকল্পটিতে মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের বীর্যবন্ত প্রাণসত্যটি ব্যঞ্জিত হয়েছে। দীনবন্ধুবিষয়ক কবিতাটি অবশ্য সাফলের এই স্তরে পৌছায় নি। কিন্তু এর স্বল্পস্ফীত দেহে নাট্যকারের বেদনামথিত কৌতুকরস সৃষ্টির ইঙ্গিতটি ধরা পড়েছে। তবে কবিতার সমাপ্তি বিবরণধর্মী হয়ে পড়ায় কাব্যিক আবেদন অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে। 'রাজর্ষি রামমোহন' কবিতায় নবীন ছন্দের পরীক্ষা আছে, তথ্যবিবৃতির আধিক্যে উক্ত বিপুল ব্যক্তিত্বের পরিচয় অবগুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে।

আশা দিয়া ভাষা দিয়া বাঁচালে স্বদেশ,
অর্থহীন নারীহত্যা-পাতকের শেষ
করিলে বাঁচালে বহু প্রাণী,
যুক্তিবলে মুক্তি দিলে আনি ;
বেদান্ত, কোরান, বাইবেলে
মিলালে তুমি হে অবহেলে ; ইত্যাদি।

ছন্দের পাত্রে এরূপ শুষ্ক তথ্যের সঞ্চয় নিশ্চয়ই কবিতা হিসেবে গ্রাহ্য হবে না।

রমেশচন্দ্র দত্ত ('দেশবন্ধু') বা হেমচন্দ্র বিষয়ক কবিতা অকিঞ্চিৎকরতার স্তর ছাপিয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধে লেখা দুটি সনেটেই (১৪ই জ্যৈষ্ঠ) তথ্যবিবৃতিকে অতিক্রম করে জ্ঞানসাধকের ব্যক্তিত্বের মূর্তিটি ভাষারূপে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে দ্বিতীয় সনেটটিতে বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্পর্শ, কবির বিশিষ্ট জীবনজিজ্ঞাসার স্থুর অন্যতর আস্বাদ এনেছে। আপন জ্ঞানপিপাসাকে পিতামহের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত করে কবি তার শ্রদ্ধা-তর্পণ করেছেন—

হে আদর্শ জ্ঞানযোগী ! হে জিজ্ঞাসু তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর ;—গরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায়।

'টিকিমেধ যজ্ঞ' এবং 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' উভয় কবিতায় কালী-প্রসন্ন সিংহকে অবলম্বন করে মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামিকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। মনীষীবন্দনা এখানে প্রাসঙ্গিক মাত্র, কবির সমাজ-চেতন মন এখানে ব্যঙ্গরসেই উদ্বুদ্ধ।

এই কবিতাগুলির অধিকাংশই আয়তনে ক্ষুদ্র, অনেকগুলি তো প্রথাসিদ্ধ সনেটই। আকারগত এই সংহতি এদের তথ্যের রাজ্যে স্বাধীন পরিক্রমার স্থযোগ দেয় নি, কবিকে উৎকেন্দ্রিকতা থেকে বাঁচিয়েছে। এদের অনেকগুলির আংশিক সাফল্যের কারণ এখানে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বন্দনা করে লেখা 'সাগর তর্পণ' কবিতার আকারগত দৈর্ঘ্য তথ্যচর্চা তথা বালসুলভ মন্তব্যের উল্লাসধ্বনিতে রচনাটিকে পূর্ণ করেছে। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিমূর্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, সাগরে যে অগ্নি থাকে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তার অনুসন্ধানে কবি প্রারম্ভে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী স্তবকগুলিতে তাঁর জীবনের নানান চূর্ণ ঘটনার সমাবেশ কবিতাকে বিশেষ ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগরের চটি নিয়ে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করে কবিতার গাম্ভীর্য বিনষ্ট করা হয়েছে—

তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা ওই পায় ;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক একবার
শিক্ষা দিত অহঙ্কতে শিষ্ট ব্যবহার।
সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে, আনব তারে, এই আমাদের পণ ;

জগদীশচন্দ্র বসুর প্রসঙ্গে 'মনীষী মঙ্গল' নামে যে কবিতা তিনি লিখেছেন তাতে পরাধীন দেশে এরূপ প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাবে কবির স্বাজাত্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে—

দাস্য-কালি যাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে
বিশ্বেরও নমস্য আজি প্রতিভা-বিভা-উন্মেষে।

দুই একটি স্তবকে জন্তু-জড-জঙ্গমে প্রাণের লীলা আবিষ্কারে তাঁর সাধকমূর্তির একনিষ্ঠ তপস্যার চিত্র স্থান পেয়েছে, কিন্তু নানা প্রসঙ্গের অবতারণায়, মাঝে মাঝে লঘু কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় আবেদনগত নিবিডতা একেবারে বিপর্যস্ত হয়েছে। 'আলোর তোড়া' কবিতাও জগদীশচন্দ্রের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক।

রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে লেখা ক্ষুদ্র কবিতায় ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রজ্ঞাসমুজ্জ্বল চিত্তের প্রতি প্রণতি নিবেদন করেছেন কবি। কিন্তু বিবৃতিধর্মে এর কাব্যরূপ স্খলিত।

'গোখলে'কে নিয়ে লেখা দীর্ঘ কবিতাটি লঘু ছন্দে স্বাজাত্যবোধ প্রচারে শেষ হয়ে গিয়েছে, কাব্যমহিমা লাভ করে নি। 'গান্ধীজী' কবিতাটিতে স্বাদেশিকতার সঙ্গে তথ্যপ্রীতি যুক্ত হয়েছে। গান্ধীর জীবনের যাবতীয় তথ্য কবি পরিবেশন করতে চেয়েছেন। জাতীয় আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন। তবে তাতে আন্তরিকতার সুর বড বাজে নি। কবিতা হিসেবে এই রচনাটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। গান্ধীজীর কোন ভাবমূর্তি বা ব্যক্তিরূপ এখানে প্রকাশ পায় নি, নানা ঘটনায় তা চূর্ণ হয়ে চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথবিষয়ে লেখা কবির বহুসংখ্যক কবিতা তাঁর শ্রদ্ধার

বিপুলতার সাক্ষ্য বহন করে। বাঙালির জীবনে ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি মহান অস্তিত্ব যে অনুজ কবিগোষ্ঠির প্রায় কেউই তাঁকে নিয়ে কবিতা লেখার প্রেরণাবোধ না করে পারেন নি।

সমকালীন প্রায় সব কবিই একাধিকবার রবীন্দ্রবন্দনা করে কবিতা লিখেছেন। পরবর্তী কবিগোষ্ঠির সঙ্গে এঁদের রচনার পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কালিদাস রায় এমন কি মোহিতলাল পর্যন্ত এসব কবিতায় কবির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধানিবেদনে কর্তব্য পালন করেছেন। করুণানিধান বলেছেন—

নিত্য করি অবগাহন পুণ্য তব কাব্য প্রয়াগ স্রোতে,
সহস্র দল, সহস্র রূপ তোমার মানস লোকে···

যতীন্দ্রমোহনের ভাষায়—

আজি শুধু স্তব্ধ হয়ে ভাবি মনে মনে কী যে তুমি ধন!
বিধাতার আশীর্বাদ,—তব স্পর্শে ধন্য এ জীবন।

মোহিতলালের কবিতায় আছে—

তোমার প্রখর তাপে কাননের যত বৈতালিক
নিরুদ্দেশ; দুই চারি হেথা হোথা পল্লবের ছায়
করিছে কূজন বটে—দুঃসাহসী কলকণ্ঠ পিক!—
কে শোনে তাদের গান?

এসব কবিতায় বিষয়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত; পরবর্তী কালের কবিতায় বিষয়ী বড় হয়ে উঠেছে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২২শে শ্রাবণ সম্পর্কে লিখেছেন, কবির মরদেহের শ্মশানযাত্রায় তিনি ফুলের অর্ঘ্য আনেন নি। তাঁর পথে ফুলের দোকান পড়ে না। বিষ্ণু দে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন—

রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা, খোলা রাখি গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎস খুঁজে পাই খরস্রোত নব আনন্দের।

এসব কবিতায় যতীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রভৃতির মনের কাছে পৌঁছই, রবীন্দ্রনাথের কাছে নয়; যেমন কবির স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা কবিতায় আছে তাঁর আত্মবীক্ষা।

সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে করুণানিধান-কালিদাস রায়দের ন্যায় শ্রদ্ধা-বিস্ময় প্রকাশসূত্রে বিষয়কে তুলে ধরেছেন, নিজেকে নয়। সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশাভিমান, বাঙালিগর্ব রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উল্লাস বোধ করতে চেয়েছে। 'নমস্কার' কবিতার প্রথম তিন স্তবকে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বগৌরব, চতুর্থ স্তবকে তাঁর ঋষিত্ব, পঞ্চম স্তবকে জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রসঙ্গে তাঁর সাহসিক স্বাদেশিকতা, ষষ্ঠ স্তবকে যুদ্ধক্ষত য়ুরোপে শান্তিদূত রূপে তাঁর আবির্ভাব এবং পরবর্তী স্তবকগুলিতে স্বদেশে-বিদেশে তাঁর সর্বপূজ্যতা ঘোষিত হয়েছে। কোথাও উচ্চকণ্ঠ রাজনীতির প্রচার—

ঘোষিলে আত্মার জয় কামানের গর্জন ছাপায়ে
অত্যাচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটাপড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি রাজ-রোষ উপরাজে দিল যে ধিক্কার—

এবং কোথাও বিদেশে কবির সম্মান লাভে বালসুলভ উত্তেজনা—

নিশীথে মশাল জেলে যার আগে নাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি তাজ যার লাগি কাতারে কাতার

শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার,
দ্বন্দ্ব ভুলি 'হূণ' ; 'গল্' যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার,

প্রকাশ পেয়েছে। কবিতায় ভাবগত ঐক্য রক্ষিত হয় নি। কবিতা-কমল-কুঞ্জ, আনন্দের ইন্দ্রধনু, আত্মার সৌরভ, চকোরের গান, চন্দন তরুর বন, বৈজয়ন্তহার প্রভৃতি অনেক সুন্দর কাব্যিক শব্দ ও বাক্যাংশের প্রয়োগ থাকলেও আন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ততার এবং ভাবানুভূতির ঐক্যের অভাব তাদের ব্যর্থ করে দিয়েছে।

'শ্রদ্ধাহোম' নামক কবিতায় গৌড়ী গায়ত্রী ছন্দে কবিগুরুর প্রশস্তি রচনা করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ প্রধানত ছন্দমুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। 'কবি-জুবিলি' নামে একটি দীর্ঘ কবিতায় তিনি কবিগুরুর জুবিলি উৎসব পালনের যুক্তি দেখিয়েছেন এবং নানা দিক থেকে কবিকৃতির উপরে আলোকপাতের চেষ্টায় ষোলটি ভিন্ন ভিন্ন কবিতা লিখেছেন। এর মধ্যে 'বিশ্বযোগী-ভারতমহিমা' নামক সনেটটিতে প্রকাশভঙ্গির গাম্ভীর্যে কবির ভাবতচেতনা একটি একাগ্র, সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট বাণীমূর্তি লাভ করেছে। 'কবিপ্রশস্তি' একান্ত মামুলী সংবর্ধনা কবিতা। ফরমায়েসী কবিতার মত বিশেষ উপলক্ষে এ জাতীয় কবিতা লেখা হয়, রচয়িতার কবিপ্রাণের কোনো গূঢ় বাণী, কোনো বিশিষ্ট জীবনদর্শন এদের মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় না। 'অর্ঘ্য' এই শ্রেণীর অপর কবিতা। কবির প্রাচীন ভারত পরিক্রমার পরিচয় তথ্যরূপে এ কবিতায় ধরা পড়েছে, তা কবিতার অকিঞ্চিৎকরতা ঘোচাতে পারে নি। 'জ্যোতির্মণ্ডল' কবিতায় পূর্বপরিকল্পনার (Scheme) চিহ্ন এতই প্রকট যে বালসেব্য রচনার উর্ধ্বে এটি উঠতে পারে নি। 'দিগ্বিজয়ী' কবিতায় কবির নোবেলপ্রাইজ প্রাপ্তির উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু বিবৃতিধর্ম অতিক্রম করে তা শিল্পমহিমা লাভ করে নি। 'ক্ষুদ্রদেহ' এই কবিতায়ও সত্যেন্দ্রনাথ ইতিহাস-পুরাণের

তথ্যসন্নিবেশ থেকে বিরত হন নি। ঐ একই বিষয়ে লেখা 'আভ্যুদয়িক' দীর্ঘাকৃতি কবিতা। কবিতাটি আদ্যন্ত চপল কল্পনা এবং প্রগল্‌ভ উত্তেজনায় পরিপূর্ণ—

'রাজার পূজা আপন দেশে, কবির পূজা বিশ্বময়'—
চাণক্যের এই বাক্য প্রাচীন মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয়।
পাহাড়-গলা ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গসাগর থেকে,
গল্‌ল এবার কঠোর তুষার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে,
বাতাসে আজ রোল উঠেছে "নিঃস্ব ভারত রত্ন রাখে।"
সপ্ত-ঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিন্ধু ঘোটক হাঁকে!

সব মিলে বলা চলে সত্যেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রবিষয়ক কবিতা সংখ্যায় বহু হলেও গুণের বিচারে সামান্যতা অতিক্রম করতে পারে নি।

॥ ছয় ॥

যে তিনটি প্রবণতাকে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকল্পনার প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন নি এবং যাদের অতিরিক্ত সমাবেশ তাঁর বহু-সংখ্যক কবিতাকে সাফল্যবঞ্চিত করেছে; তা হল,—এক। রাজনৈতিক-সামাজিক প্রচার-প্রবণতা। দুই। তথ্য সমাবেশের ঝোঁক এবং জ্ঞানচর্চাকে কবিতায় প্রয়োগের চেষ্টা। তিন। ছন্দ নিয়ে নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিকসুলভ পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

এ অধ্যায়ে প্রধানত প্রথম প্রবণতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ভাবে দ্বিতীয় প্রবণতার কথাও বলেছি। এই দ্বিতীয় প্রবণতাটি অন্য নানাবিধ কবিতায়ও কি পরিমাণ প্রাধান্য পেয়েছে তার কিছু পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

কবির কবিতায় পুরাণের তথ্য আছে, পৌরাণিক রস নেই। সে যুগের বর্ণাঢ্য গাম্ভীর্য, প্রবল বীর্যের সুবিপুল মহিমা সত্যেন্দ্রনাথের

কবিপ্রাণকে এমন কিছু উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি। তাঁর বহু কবিতায় ইতিহাসবিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। সেখানেও ঐতিহাসিক রসের স্ফূর্তি নেই। একটা জাতির জীবনে যুগক্রান্তিতে যে তরঙ্গচাঞ্চল্য ধ্বনিত হয়, সত্যেন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে তা ধরা পড়ে নি। অনেক জানার আনন্দে তিনি নিশ্চিন্ত, প্রচুর তথ্যের উল্লেখে কবিতাকে ভরে দিয়েই তাঁর তৃপ্তি।

'কবর-ই-নূরজাহান' নামে একটি কবিতা খুব সম্ভাবনা নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। এই অগ্নিশিখা সদৃশ নারী নিজ রূপে আপন আত্মাকে দগ্ধ করেছে, অগ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের মত তার প্রেমমুগ্ধদেরও বিনষ্ট করেছে। আপন চরিত্র এবং নিয়তি সম্পর্কে তার তীক্ষ্ণ সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে নিজ কবরের জন্য পূর্বাহ্নেই রচিত এই কবিতায়—

বর্ ম্যজারেমা গরীবাঁ ন্যঃ চেরাগে ন্যঃ গুলে
ন্যঃ পরে পরমানা সুজদ্ ন্যঃ স্যতায়ে বুল্‌বুলে।

সত্যেন্দ্রনাথ এই শ্লোকের সুন্দর অনুবাদ করেছেন—

গরীব-গোরে দীপ জ্বেল না, ফুল দিওনা কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে।

কিন্তু এ শ্লোক দিয়ে কবিতাটি শুরু করলেও সত্যেন্দ্রনাথ এর অন্তর্নিহিত দাহযন্ত্রণা ও ব্যর্থ জীবনচেতনাজাত হাহাকারটি আদৌ ধরতে পারেন নি। নূরজাহানের জীবনের নানা কাহিনী তিনি অনর্গল বর্ণনা করে গিয়েছেন। ঘটনার প্রাচুর্যে কোনো বিশিষ্ট ভাবকেন্দ্র বা জীবনব্যাখ্যানই স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এ কবিতায় ফার্সী শব্দের সুসঙ্গত ব্যবহার কবির শব্দচেতনার প্রমাণ। মুসলিম ভাবপরিবেশ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ফার্সী শব্দের আশ্রয় তিনি গ্রহণ

করেছেন। তবে ভাবকল্পনাগত ত্রুটি ও কেন্দ্রহীনতা এর সামগ্রিক আবেদনকে একেবারে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

('তাজ' কবিতায়ও তথ্যপ্রীতি মাঝে মাঝে দীর্ঘ ক্লান্তিকর তালিকা-প্রণয়নে কবিকে উৎসাহিত করেছে—

সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল,
তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
বুন্দেলী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল,
স্থলেমানী মণি থরে থর,
ইরানী গোমেদ, মরকত থাল থাল
পোখ্‌রাজ, বুঁদি, গুল্‌নর,
চার-কো পাহাড় ভাঙা মসী মর্মর
চীনা তুঁতী, অমলস্ফটিক,
যশলমীরের শোভা মিশ্র-বদর
এনেছ ঢুঁড়িয়া সব দিক,
মধুমৎত্বিষ্‌ মণি ঢুধিয়া পাথর
দেউলে দেওয়ালী মণি-শিখ !

সত্যেন্দ্রনাথের ভাবনায় 'তাজ' প্রেমের মন্দির, কবর নয়। নবাবী প্রেমের সঙ্গে জড়িত ছিল যে কামনার বিষ মৃত্যুতে তার সমাধি ঘটেছে, শুধু অশরীরী বিশুদ্ধ প্রেম বেঁচে রয়েছে এই সৌধের অমলিন সৌন্দর্যে। তাজমহল রবীন্দ্রনাথসহ বাঙালি বহু কবিকে প্রেরণা যুগিয়েছে। 'শাজাহান' কবিতায় এই সৌধের বস্তুরূপ বা ভাবরূপ একান্ত গৌণ, কবির একটি তত্ত্বচেতনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। বলাকার অপর একটি কবিতায় তত্ত্ব প্রাধান্য থাকলেও তাজের একটি ভাবরূপও মূর্ত—

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ।
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
বরষ বরষ।
তাই দেবলোকপানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি
ধরণীর আনন্দমঞ্জরী ;
তাই তো তোমারে ঘিরি বহে বারোমাস
অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষণ্ণ নিশ্বাস ,
মিলন রজনীপ্রান্তে ক্লান্ত চোখে
ম্লান দীপালোকে
ফুরায়ে গিয়েছে যত অশ্রুগলা গান
তোমার অন্তরে তারা আজিও জাগিছে অফুরান,
হে পাষাণ, অমর পাষাণ॥

রবীন্দ্রভাবনার দেহাতীত অরূপাকৃতি এখানে বেজেছে। সত্যেন্দ্রনাথে এর প্রভাব অনুভব করা যায়, যদিও সে গভীরতা এখানে একেবারেই প্রত্যাশিত নয়। কামিনী রায় একটি সনেটে সংশয় প্রকাশ করেছেন, ভ্রাতৃহত্যায় যার হাত কলঙ্কিত সেই হাত এই অপরূপ সৌন্দর্যময় সৌধ নির্মাণ করল কি করে? যে ভ্রাতৃরক্তপাতে সিংহাসনে বসে তার হৃদয়ে প্রেম নেই। প্রেমহীন হৃদয়ই কি শিল্প-শোভার সার এই সৌধ সৃষ্টি করেছে? আবার প্রমথ চৌধুরী একটি সনেটে তাজমহল সম্পর্কে বলেছেন—

ব্যক্ত রূপ স্তরে স্তরে রয়েছে সঞ্চিত
প্রেমের রহস্যে কিন্তু একান্ত বঞ্চিত।

এবং মুঘল হারেমে যে প্রেম থাকতে পারে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত

সিদ্ধান্ত করেছেন—

জরিতে জড়িত বেণী, অধরে তাম্বুল,
বাদশার ছিলে তুমি খেলার পুতুল।

সত্যেন্দ্রনাথে কামিনী রায়ের সংশয়-জিজ্ঞাসা নেই, নেই প্রমথ চৌধুরীর বক্র-কটাক্ষও। 'মমতাজ' নামে 'বেণু ও বীণা'য় আর একটি কবিতাও আছে। সেটি এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।)

'দিল্লীনামা' নামক একটি দীর্ঘ কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দিল্লী-নগরীকে কেন্দ্র করে নানা ঐতিহাসিক তথ্য ও পৌরাণিক চিন্তাকে বিন্যস্ত করেছেন। যুগে যুগে বহু নৃপতি-সেবিত মোহিনী, রূপসী, মহিমাময়ী দিল্লী নগরীর একটি কেন্দ্রীয় ভাবের সূত্রে পঞ্চদশ কলিবিশিষ্ট এই কবিতা গ্রথিত। কিন্তু সূত্র এতই ক্ষীণ এবং তথ্য-সঞ্চয় এত বাধাহীন যে ভাবকেন্দ্র প্রায়ই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ঐতিহাসিক রসসৃষ্টিতে কবির ব্যর্থতা এখানে অতি প্রকট হয়ে উঠেছে।

'বারানসী' কবিতাটিও এই একই ধরনের। ধর্মবোধ, পুরাণচর্চা ও ইতিহাস ঘটনার উল্লেখে পূর্ণ এ কবিতায় যেমন নেই কোনো ভাবকেন্দ্র তেমনি কোনো ভাবানুভূতির বিশিষ্টতা। এ প্রসঙ্গে 'সরযূ' কবিতার নামোল্লেখও করা চলে। এমন কি 'সিংহল'-এর ন্যায় অতিক্ষুদ্র কবিতায়ও তথ্যপ্রীতিকে সংযত করতে পারেন নি কবি, চানও নি।

চতুর্থ অধ্যায়

ফুলের বন : বৃষ্টি এল

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি,
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী

—হজরত মহম্মদ

মেঘ দেখিলে "সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ" সুখী লোকেরও আন্‌মনা ভাব হয়…। মেঘ মনুষ্যলোকের কোনো ধার ধারে না বলিয়া মানুষকে অভ্যস্ত গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যায়। মেঘের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা, চেষ্টা, কাজকর্মের কোনো সম্বন্ধ নাই বলিয়া সে আমাদের মনকে ছুটি দেয়। মন তখন বাঁধন মানিতে চাহে না, প্রভুশাপে নির্বাসিত যক্ষের বিরহ তখন উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ সংসারের সম্বন্ধ; মেঘ সংসারের সেই প্রয়োজনীয় সম্বন্ধগুলাকে ভুলাইয়া দেয়, তখনি হৃদয় বাঁধ ভাঙিয়া আপনার পথ বাহির করিতে চেষ্টা করে

—রবীন্দ্রনাথ : বিচিত্র প্রবন্ধ

॥ এক ॥

প্রকৃতি চিরকালই কবিতার একটি প্রিয় বিষয়। রোমান্টিক কবিদের হাতে পড়ে প্রকৃতি হয়ে দাঁড়াল মানবজগতেব তুলনায় এক উচ্চতর সত্তা। জীবনের দায়িত্ব সেখানে নেই, নেই সীমাবদ্ধতা। অসীমের মুক্তির দ্যোতনা সে নিয়ে আসে, যান্ত্রিক কোলাহলের বাইরে সৌন্দর্যের ও আনন্দের রাজ্যে মানুষকে মুক্তি দেয়। বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল থেকে এধারার সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথে তা দার্শনিকতা, অসীমানুভূতি প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিস্ময়কর অভিনবত্ব এবং সৌন্দর্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রানুজ কবিগোষ্ঠির প্রকৃতিপ্রীতি শহরকে ধিক্কার দিয়েছে, গ্রামবাংলাকে মাহাত্ম্য দিতে চেয়েছে। এ ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা উচিত।

প্রথমত, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়ও প্রকৃতি একটি প্রধান বিষয়। কিন্তু কোনো বিশিষ্ট প্রকৃতিচেতনা তাঁর কবিতাগুচ্ছে প্রতিফলিত নয়। কর্মমুক্ত খুশির সুর অনেক স্থানে প্রকাশ পেলেও তা তত্ত্ব হয়ে ওঠে নি। কবির প্রকৃতিচেতনা মানবসংসাবকে অস্বীকার করে নি। তার চার পাশেই এক বর্ণবহুল চিত্রগৃহের শোভা বিস্তার করেছে অথবা লঘু সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করেছে। রবীন্দ্র-অনুজ অনেক কবি নগরবিমুখী যে মনোভাব পোষণ করেছেন এবং তাঁদের পল্লীবাংলার প্রতি অত্যধিক প্রীতিতে প্রকৃতিপ্রেম যেভাবে রূপলাভ করেছে, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁর সামীপ্য নেই। সত্যেন্দ্রনাথে পল্লীবাংলা সম্পর্কে কোনোরূপ ভাবালুতার অতিরেক লক্ষণীয় নয়।

দ্বিতীয়ত, সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতি কবিতায় ঋতুবর্ণনা, পুষ্প প্রসঙ্গ, পর্বত, সমুদ্র ও নদীর কথা প্রাধান্য পেয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে দেখলে বলতে হয় ফুল সম্পর্কিত কবিতাগুলি কবিচিত্তের আকর্ষণের মুখ্য অংশ ধরে রেখেছে। এই বিষয়ে কয়েকটি কবিতায় ভাবানুভূতির অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সমুদ্রবিষয়ক কয়েকটি কবিতায়ও বীর্যবন্ত গাম্ভীর্যের চিত্রাঙ্কনে সাফল্যের পরিচয় আছে। অন্য যে দিকে কবির লক্ষ্য বেশী করে পড়েছে তা হল বর্ষাঋতু। মৌলিকতার পরিচয় না থাকলেও লঘুরস সৃষ্টিতে সাফল্যের পরিচয় আছে এ জাতীয় কবিতায়।

তৃতীয়ত, সত্যেন্দ্রনাথ কোথাও কল্পনার ডানায় ভর করে সুদূরে উড়ে যান নি, কোথাও বস্তুরূপকে আপন অন্তররসে জারিত করে একান্ত নবীন করে তোলেন নি। বস্তুর চিত্রাঙ্কনেই তিনি উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, কল্পনার সহায়তা যেখানে গ্রহণ করেছেন সেখানেও বস্তুর নিকটেই অবস্থান করেছেন। অবশ্য লঘু খেয়ালী কল্পনা বস্তুর চারধারে একটা মায়া রাজ্যের সৃষ্টি করে বহুক্ষেত্রে স্বাদুতা এনেছে।

॥ দুই ॥

বাংলাদেশের ষড় ঋতুর লীলা মহোৎসবে সত্যেন্দ্রনাথও যোগ দিয়েছিলেন। কবির ঋতুবিষয়ক কবিতাগুলির কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের কথা মনে আসে।

এক। 'হেমন্তে' বা 'শীতের শাসন' নামক দু-একটি কবিতায়ই উক্ত দুইটি ঋতুর প্রতি কবি তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্তব্য সমাপন করেছেন। গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতু নিয়ে লেখা কবিতার সংখ্যাও অধিক নয়।

গ্রীষ্মকাল নিয়ে লেখা কবিতার মধ্যে 'গ্রীষ্মের সুর', 'গ্রীষ্মচিত্র', 'বৈশাখী' এবং শরৎকাল প্রসঙ্গে 'চিত্রশরৎ', 'ভাদ্রশ্রী', 'শরতের হাওয়ায়' উল্লেখযোগ্য। মনে হয় হেমন্ত এবং শীতের মধ্যে লক্ষ্য-যোগ্য উপকরণ কবি দেখতে পান নি। এরা কবিতার ঋতু নয় এরূপ প্রচলিত ধারণাও কবিকে উক্ত বিষয়-পরিক্রমা থেকে নিবৃত্ত করে থাকবে। গ্রীষ্ম এবং শরৎ ঋতু কবিকে উৎসাহিত করে নি এমন নয়, তবে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা না থাকায় এ বিষয়ে স্বল্পসংখ্যক কবিতা মাত্র রচিত হয়েছে।

দুই। প্রধানত বর্ষা ও বসন্ত ঋতু নিয়ে কবিতা লিখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। এদের সংখ্যার বহুলতাও লক্ষণীয়। বর্ষাবিষয়ক কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বর্ষা', 'ইল্‌শেগুড়ি', 'বর্ষানিমন্ত্রণ'. 'যক্ষের নিবেদন', 'প্রাবৃটের গান', 'মেঘের কাহিনী', 'বর্ষায়', 'মেঘের বারতা', 'শ্রাবণী', 'আষাঢ়ের গান' এবং 'কাজরী পঞ্চাশ-'এর অন্তর্ভুক্ত পঞ্চাশটি ক্ষুদ্র কবিতা। বসন্ত বিষয়ে লেখা বিশিষ্ট কবিতা হল 'জ্যোৎস্না মদিরা', 'কু', 'মদন মহোৎসব', 'মধু-মাসে', 'শীতান্তে', 'নব বসন্তে', 'ফাগুনে', 'বসন্তে', 'জ্যোৎস্না-লোকে', 'ফাল্গুনী হাওয়া', 'জ্যোৎস্নামেঘ', 'জ্যোৎস্না অভিসার', 'চৈত্রহাওয়ায়'। এই দুই প্রধান ঋতুই এদেশের কবিদের সর্বাধিক চঞ্চল করেছে। বসন্তের প্রেম-প্রগল্‌ভতা কবিদের অবশ্যমান্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ যতটা প্রথানুসারী ততটা স্বাধীন নন। প্রত্যক্ষ রূপের আনন্দ নিয়ে বর্ষা দেখা দিয়েছে কবির কাছে। বাংলাদেশের বর্ষার সেই নিজস্ব রূপটি কবিকে আকর্ষণ করেছে। রূপসিদ্ধি কোথাও কোথাও বিচলিত হলেও বৃষ্টি-ভেজা দিনে কবির প্রাণময়ূরের নৃত্যে আন্তরিকতা সর্বাধিক। বসন্তকে বর্ষা নিশ্চিত হারিয়ে দিয়েছে।

তিন। রবীন্দ্র ঋতু-ভাবনাদ্বারা কবি প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিক সুদূরার্তি, চিরকালীন সৌন্দর্য-বিরহের যে নিবিড় স্বপ্ন ঋতুচেতনার সঙ্গে সংবদ্ধ তার থেকে সত্যেন্দ্রনাথের দূরত্ব স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ ঋতুপরিক্রমার কেন্দ্রে বিশ্বদেবতা নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যকে অনুভব করেছেন। সেই তাণ্ডবের তালে তালে ঋতুর থালিতে নব নব পুষ্প পল্লবের সজ্জা। বিচিত্র ঋতু এই নৃত্যসূত্রে এক মাল্যে গাঁথা পড়েছে। গ্রীষ্মের রুদ্র তপস্যা তাই রসের কামনায় অন্তরের গভীরে চঞ্চল, বর্ষার নিবিড় বর্ষণব্যাকুলতা শরতের হালকা খুশির খেয়ালীপনায় দায়িত্বহীন, হেমন্তের কর্মতারগ্রস্ত প্রচুর সঞ্চয়ে শরতের কাজভুলানো দিনগুলোর অবসান, সর্বহারা শীতে রিক্ততার সাধনায় পাতা হয় বসন্তের বর্ণবিহ্বল প্রেম চঞ্চল আসন। রবীন্দ্রচেতনায় যে পুর্ণতার আদর্শ দীপ্যমান তাঁর ঋতু-বোধেও সেই ঐক্যের বাণীই উচ্চারিত। অন্য কবিতে তা মিলবে না। সত্যেন্দ্রনাথ বিচিত্রের রূপে মুগ্ধ, ঐক্যের দার্শনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ নন। রবীন্দ্রনাথের ঋতুসৌন্দর্যে অসীমের আহ্বান বাজে, মানুষের কাজ ভুলিয়ে দেয় নবীন ঋতুর আবির্ভাব, অকাজের মধ্যেই অন্তরের সুপ্ত জীববৃত্তের উর্ধ্বস্থিত সত্য মনুষ্যত্ব জেগে ওঠে। সত্যেন্দ্রনাথ সেই গভীরকে স্পর্শ করতে চান না, কর্মহীন সহজ আনন্দে আন্দোলিত হয়েই তিনি তৃপ্ত, সেখানে দূরের সুর বাজে না, আকাশদীর্ণ আত্মার হাহাকার শ্রুত হয় না।

চার। সত্যেন্দ্রনাথের ঋতু কবিতায়ও কল্পনা অপেক্ষা বস্তুচিত্রের প্রত্যক্ষতার প্রতিই অধিক আনুগত্য লক্ষিত হয়। কল্পনা যেখানে আছে সেখানেও হয় তা বস্তুর অতিনিকট প্রদেশের অধিবাসী অথবা লঘু চাপল্যে লীলারত।

'গ্রীষ্মের সুর' কবিতা হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এর ছন্দ বিশেষ করে স্তবকনির্মাণের অভিনবত্বে প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। স্তবকগুলির আকৃতি আপাতদৃষ্টিতে যান্ত্রিকতাদুষ্ট মনে হতে পারে। কিন্তু কবিতার চিত্ররস ও সুরব্যঞ্জনার সঙ্গে এই সজ্জা নিঃসম্পর্কিত নয়। চরণগুলি হ্রস্ব থেকে দীর্ঘ হতে হতে দুমাত্রা থেকে চব্বিশ মাত্রায় পৌঁছেছে এবং তারপরে আবার হ্রস্ব হতে হতে দুমাত্রায় গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম 'হায়' শব্দটি দুটি মাত্রার সংক্ষিপ্ততায় সীমাবদ্ধ, কিন্তু শেষের 'হায়' শব্দটি দীর্ঘশ্বাসের মত উচ্চারিত। দীর্ঘতম চরণগুলিতে শব্দচয়নে এবং চিত্ররচনায় গ্রীষ্মের রুদ্রতা যেন ধরা পড়েছে। পরবর্তী হ্রস্ব চরণগুলিতে ক্লান্ত গ্রীষ্মের দীর্ঘায়ত নিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে।

দীর্ঘতম চরণে দীপ্ত জ্বালা প্রকাশিত—

॥ ১ ॥ দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্জ্বল-অনিমিখ

॥ ২ ॥ অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মূৰ্চ্ছি বুঝি পড়ে,—আর সে ছুটাবে কত দূর ?

সপ্তসাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,

॥ ৩ ॥ হর্ম্যতলে, জলে, স্থলে, স্নিগ্ধ পুষ্পদলে আজ শুধু অগ্নিকণা ক্ষরে,

॥ ৪ ॥ কে করিবে অনুযোগ ? দেবতার কোপ; কোথা বা করিবে অনুযোগ ?

সমাপ্তির হ্রস্ব চরণে ক্লান্তি ঘনীভূত—

॥ ১ ॥ ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায়,
হায় !

॥ ২ ॥ পুষ্পে রস—তাও পিয়ে চুপে !
তৃপ্তি নাহি পায়,
হায় !
॥ ৩ ॥ দীর্ঘ দিন যায়,
হায় !
॥ ৪ ॥ দগ্ধ দেশে তৃষায় আতুর,
ক্লান্ত চোখে চায়,
হায় !

সমগ্র কবিতা রুদ্র রৌদ্রের অন্তর্নিহিত দাবদাহে পূর্ণ। চিত্র-কল্পনা ও শব্দচয়নে কঠিন বীর্য বিস্ময়কর সার্থকতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গ্রীষ্ম তপস্বী। বহুরূপী নটবাজের সঙ্গে এ অনেক সময়ে একাকার। বর্ষার রসবর্ষণে হবে তাব তপোভঙ্গ। সত্যেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে মাত্র বসুন্ধরার কৃচ্ছ্রব্রতের কথা বলেছেন। এবং সে ব্রত নিষ্ফলা,—'ওঠে না অনিন্দ্য চরু আমোঘ প্রসাদ'। দার্শনিক চিন্তা বা গভীর মৌলিক কোন ভাবকল্পনা ছাড়াই এ কবিতাব প্রত্যক্ষ চিত্রবসের সার্থকতা স্বীকার্য।

শরৎকালের হালকা আনন্দের সুরটি 'কাশফুল' কবিতায চমৎকার দ্যোতিত হয়েছে। কিন্তু অন্যত্র শরতের রূপ বা ভাবরস প্রকাশে তেমন সাফল্য আসে নি। 'চিত্রশরৎ' কবিতায় লঘু চপল কল্পচিত্রের ভীড়। কাশফুলে চিত্র ভাবের স্পর্শে ইঙ্গিতবাহী, বর্তমান কবিতা চিত্রসর্বস্ব। কাশফুলে imagination বা গভীর কল্পনাব স্পর্শ আছে, চিত্রশরৎ নেহাৎই fancy ; শরতের ছিন্ন বৃষ্টির বর্ণনায় সাঁওতালী নাচেব এই উপমা উপভোগ্য হলেও মনের বাহির মহলের তবলতা ও ক্ষণিকতার রাজ্যেই এর আবেদন—

হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
আবছায়াতে মূর্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে ;
শূন্যে তারা নৃত্য করে, শূন্যে মেঘের মৃদং বাজে,
শালফুলেরি মতন ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে।

বাংলাদেশের গ্রামের স্নিগ্ধ শারদশ্রী সত্যেন্দ্রনাথে বড় প্রকাশ পায় নি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কিন্তু গাঢ় বর্ণাঢ্য কল্পনা ভেদ করেও সে রূপ অনেকটা প্রাণবন্ত।

বসন্তবিষয়ক কবিতাগুলিতে প্রথানুগত, মামুলী প্রেম-পরিবেশ ভেদ করে কোনো মৌলিক অনুভূতি প্রকাশ পায় নি, কবির আন্তরিকতার স্পর্শও এদের মধ্যে অনুভব করা যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ কবিজীবনের প্রথম পর্বে গভীর রসের প্রেমকবিতা কিছু লিখেছেন। কিন্তু 'বেণু ও বীণা'র পরে তাদের সংখ্যা একান্ত নগণ্য। প্রেমানুভূতির গভীর অনিবার্য ব্যাকুলতা, অসীমাকুতি, রোমান্টিক বিচিত্রতা ও রহস্যবোধের জগতে তাঁর কবিচিত্ত স্বস্তি পায় না। পরিণত বয়সে চটুল সুরের আলাপব্যপদেশে পরীর রাজ্যের হালকা প্রেমের কথা কখনো বলেছেন মাত্র। বসন্ত ঋতু বর্ণে-গন্ধে প্রগল্‌ভ প্রেম-বেদনাকে উদ্বেল করে তোলে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিভাষা এ ভাবানুভূতি প্রকাশ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। কবি যদি বসন্ত ঋতুর অন্তর-ভেদের এই সাধনা না করে তার ফুলপত্রের বর্ণবিচিত্রতায় মুগ্ধ হতেন, তবে প্রত্যক্ষ চিত্র-সৃষ্টির সাফল্য থেকে এজাতীয় সব কবিতা বঞ্চিত হত না।

বাংলাদেশের বর্ষার স্থায়িত্ব দীর্ঘকাল বিস্তৃত, রূপের বিচিত্রতাও লক্ষণীয়। রূপবৈচিত্র্য রসের জগতে আস্বাদের বিভিন্নতা নিয়ে

আসে। কখনো আষাঢ়ের নবমেঘে চিত্তলোকের উদ্বোধন ঘটে; শ্রাবণের ধারাবর্ষণ কর্মলোকের জাগ্রত বুদ্ধির উপরে যেন ঘন যবনিকার আড়াল টেনে দেয়; হালকা বৃষ্টির স্বল্পতা চপল প্রমোদের বাজনা বাজায়; শরতের আগমনে রোদ-বৃষ্টির হাসি-কান্নার খেলা রঙের তুলি বুলায় আকাশে আর পৃথিবীতে। নানারূপে বর্ষা দেখা দিলেও ব্যাকুল অন্তহীন ধারাবর্ষণের প্রবলতাই স্থায়ী রূপ ধরে প্রভাব বিস্তার করে মানবচিত্তে। বর্ষার অন্যান্য রূপ-বিচিত্রতা অঙ্গরস হতে পারে, অঙ্গী ঐ প্রাচুর্য, ব্যাকুলতা, অন্তহীন সর্বপ্লাবী বর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বর্ষণের মত্ত আনন্দে চাপল্যের সুর ক্বচিৎ তুলেছেন—

তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিতবিকশিত বয়ানে—
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষা মূলত দেখা দিয়েছে একবেণীধারিণী বিরহিনী নারীরূপে। মিলনকামনায় তার আকুলতা আকাশকে স্পর্শ করে। কাজের দুয়ার রুদ্ধ করে হৃদয়লোকের দ্বার সে খুলে দেয়। এ নারী চিরন্তনী—তার রূপে কালিদাসের কালের যক্ষবধূর অঙ্গলাবণ্য ও প্রসাধন উঁকি দেয়, তার চিত্তরসে সর্বকালের মানব-প্রাণের ক্রন্দন শোনা যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ ক্বচিৎ সংস্কৃত শব্দের ঝংকারে বাদল দিনের গহন গম্ভীর পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন—

বৃহৎ সুখে বৃংহিতে কি দিগ্‌গজেরা গর্জে?
মিলাবে কি ও অমরা ধরা আকাশ ভাঙি বজ্রে?

ধরণী আছে প্রতীক্ষাতে
অর্ঘ্য ধরি খিন্ন হাতে,
সূচিত স্বরভঙ্গ তার কেকার রবে ষড়জে!

সংস্কৃত কাব্যে 'মেঘদূত' পরিপূর্ণ বর্ষার গান। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা কবিতায় ভাবব্যাকুলতা সৃষ্টির দিক থেকেই শুধু নয়, রূপাঙ্কনের তথা শব্দচয়নের দিক থেকেও কালিদাসের বিখ্যাত খণ্ডকাব্যটির প্রভাব আছে। কালিদাসের মেঘদূত বর্ষণ-পটভূমিতে সৌন্দর্য সম্ভোগের কাব্য। বাংলাদেশের কাব্য-ঐতিহ্যে বৈষ্ণবপদাবলীর যুগ থেকে বর্ষার সঙ্গে বিরহবেদনার যেন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মধুসূদন 'মেঘদূত' নিয়ে দুটি সনেট লিখেছিলেন। একটিতে বর্ণবহুল চিত্রাঙ্কন প্রাধান্য পেলেও অপর কবিতায় বিরহীচিত্তের সুতীব্র আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথে অবশ্য নিখিল সৌন্দর্যের জন্য চিরকালীন রোমান্টিক আকুতি প্রকাশিত। সত্যেন্দ্রনাথের রূপমুগ্ধচিত্ত কালিদাসের সৌন্দর্য-চিত্রের রেখাবর্ণগন্ধস্পর্শে বিহ্বল। কিছু ছন্দোঘটিত পরীক্ষা, অনুবাদের মেজাজে কিছু মূলানুসৃতি তাঁর 'যক্ষের নিবেদন' কবিতায় প্রকটিত। সেকালীন পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে কবিতার সংস্কৃত ছন্দ ও শব্দ তথা বাক্যবিন্যাস সুপ্রযুক্ত। এ কবিতার দু-একটি স্তবকে বিরহবেদনার সুর প্রাধান্য পেলেও তা তীব্র হয়ে ওঠে নি, বিশ্বব্যাপী প্রাবল্যে ফেনায়িতও হয় নি এবং এ কবিতার সামগ্রিক আবেদনে সে ক্রন্দন শ্রুত নয়।

সত্যেন্দ্রনাথ বর্ষা কবিতায় প্রধানত গহন গভীরতা বা ধ্বনিঝংকারময় সংস্কৃত কাব্যসুলভ গাম্ভীর্য ফোটাতে চান নি। কখনো বর্ষাকে তিনি পাগলী বলে কল্পনা করেছেন—

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,—
বিশাল-শাখা পাতায়-ঢাকা শালের বনেতে;

হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে,
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ঐ পায়রাগুলোকে !

'কেয়ার রেণু, কদম ফুলের রাশের' লঘুতায় কবি মুগ্ধ হয়েছেন। 'কাজরীপঞ্চাশৎ'-এ প্রেমপ্রসঙ্গকে বিজড়িত করা হয়েছে শ্রাবণবর্ষণের সঙ্গে। কিন্তু সে প্রেমও একান্ত লঘু ও চপল,—

(ওগো) তোমরা চোখে কাজল দিয়ো
হরিণ-লোচনা !
ওই কাজলে আমরা করি
কাজ্‌রী রচনা।
ওই কাজলে হয় গো সজল
বাদল-জোছনা,
ওই কাজলে উজল হিয়া
লুকায় শোচনা।

কিন্তু নিঃসন্দেহে তা মৃদু ও মধুর। এই লঘুতা 'ইল্‌শে গুঁড়ি' কবিতায় বালসুলভ উচ্ছ্বাসে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। বাংলার গ্রামজীবন এই চপল উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে উঁকি দিয়েছে,—

মেঘায় মেঘায় সূর্য ডোবে
জড়িয়ে মেঘের জাল,
ঢাকলা মেঘের খুঞ্চে-পোষে
তাল-পাটালির থাল !
লিখছে যারা তালপাতাতে
খাগের কলম বাগিয়ে হাতে,
তাল-বড়া দাও তাদের পাতে
টাট্‌কা-ভাজা চাল ;

পাতার বাঁশী তৈরী করে
দিয়ো তাদের কাল।

এখানেই সত্যেন্দ্রনাথের বর্ষা কবিতার উপভোগ্যতা এবং সীমাবদ্ধতা।

॥ তিন ॥

ফুল যুগে যুগে কবিদের আকর্ষণ করে আসছে। এ দিক থেকে বাংলা কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। 'ফুলের ফসল' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই ফুল নিয়ে লেখা। অন্যান্য কাব্যেও এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতের প্রমাণ আছে। কবির ফুলবিষয়ক বিশিষ্ট কবিতার তালিকাটি বেশ দীর্ঘ,—'কাশফুল', 'আফিমের ফুল', 'চম্পা', 'পারিজাত', 'একটি চামেলির প্রতি', 'কনক ধুতুরা', 'জবা', 'ভুঁইচাঁপা', 'আলোকলতা', 'গোলাপ', 'সূর্যমল্লিকা', 'লজ্জাবতী', 'নাগকেশর', 'সন্ধ্যামণি', 'কুঁড়ি', 'মহুয়া', 'অশোক', 'হাস্নুহানা', 'করবী', 'বকুল', 'আকন্দ', 'শিরীষ', 'জুঁই, 'কেলিকদম্ব', 'কামিনী', 'কেতকী', 'পদ্মের প্রতি', 'লীলাকমল', 'নীলপদ্ম', 'শতদল', 'কুমুদ', 'শেফালি', 'একটি স্থলপদ্মের প্রতি', 'তৃণমঞ্জরী', 'পারুল', 'অপরাজিতা', 'শিশুফুল', 'কুন্দ', 'কাঞ্চন ফুল'।

ফুলকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে কবিতা লিখে একদা বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন

কবিদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী এবং কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নামও উল্লেখ-যোগ্য। তাঁদের ফুলবিষয়ক কবিতায় সুরের বিশিষ্টতা বেশ তীব্র-ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। ফুলকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমব্যাকুলতার যে ভাব-পরিবেশ গড়ে উঠেছে, কারুর কবিতা তাকেই পুষ্ট করে তুলেছে, কেউ আবার সেই সংস্কার থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন। বিচিত্র রঙের ও রূপের ফুলের মধ্য থেকে নির্বাচন করতে গিয়ে কবি এক্ষেত্রে আপন চিত্তপ্রবণতার পরিচয় রেখে যান।

সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হয়—এক। কবি ফুল নিয়ে কবিতা লিখতে বিশেষ উৎসাহ অনুভব করেছেন। অন্য পাঁচটা সুন্দর বিষয়ের সঙ্গে ফুলও কবিতার উপকরণরূপে সাধারণত গৃহীত হয়ে থাকে; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ততটা মামুলী নয়। কবিতার সংখ্যাধিক্যের ইঙ্গিত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দুই। সব জাতের ফুল নিয়েই কবিতা তিনি লিখেছেন। পদ্ম, গোলাপ, কদম্বের মত কবিজন-বন্দিত ফুলেদের আসর জমেছে তাঁর কাব্যে; পারুল, কুন্দ, জুঁই, অপরাজিতা, তৃণমঞ্জরীর মত ক্ষুদ্র ফুলেরাও সহজ আমন্ত্রণ পেয়েছে; আফিমের ফুল, জবা, শিরীষ, আকন্দের মত পেলবতাহীন, সৌরভবঞ্চিত, আভিজাত্যবর্জিত ফুলেদেরও সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন কবি। বলা চলে কবির প্রবণতা যথেষ্ট একাগ্র নয়; ফুল নিয়ে সুপ্রচুর কবিতা তিনি লিখেছেন, কিন্তু নিজস্ব ভাবনা-কেন্দ্রে তাদের সম্বন্ধ রাখতে পারেন নি। ফুল নিয়ে কবিতা লিখতে তাঁর ভাল লেগেছে, শতধারায় লিখে গিয়েছেন। কোথাও প্রচলিত ধারার অনুকরণ করেছেন কবি, কোথাও আপন স্বাতন্ত্র্যে তাকে পুষ্ট করে তুলেছেন। তিনি। কবির এ

কবিতাগুলি আকারে ক্ষুদ্র, পুরাণ ইতিহাসের উল্লেখে কবির পাণ্ডিত্য এখানে উচ্চকণ্ঠ প্রগল্‌ভতা লাভ করে নি, তথ্যের প্রাচুর্যে কবি দিশাহারা হন নি। এই সংযম সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলিকে প্রায় কোনক্ষেত্রেই ন্যূনতম উপভোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করে নি। চার। সত্যেন্দ্রনাথ যৌবনশক্তির উৎসরূপে সূর্যকে কল্পনা করেছেন। বহু কবিতায় পুষ্প লালিত্য থেকে বীর্যের রাজ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সূর্যস্নানের পুণ্যে। চাঁপা, সূর্যমল্লিকা, কেতকী, নীলপদ্ম, প্রভৃতি কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। কতকগুলি কবিতায় বিষের ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ, এবং ক্বচিৎ মৃত্যুজয়ের সাধনার কথা প্রাধান্য পেয়েছে। সূর্য, বিষ, মৃত্যুর সূত্রে এক ধরনের সহজ কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিচেতনার ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে।

পদ্ম, গোলাপ চিরকাল ফুল-জগতে আধিপত্য করে আসছে। একালীন কবির রোমান্টিক ভাবান্ধতাবিরোধী দৃষ্টিতে সে আধিপত্য বহুক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী গোলাপকে লক্ষ্য করে লিখেছেন—

রূপে গুণে মানি তুমি জগতে অতুল
পূজায় লাগো না কিন্তু আশ্চর্য গোলাপ
দেমাকে দেবতা সনে কর না আলাপ
ফুলের নবাব তুমি নবাবের ফুল।
ইরাণের ভগ্নোদ্যানে বসি বুলবুল
স্মরিয়া স্মরিয়া তোমা করিছে বিলাপ
তুমি কিন্তু রমণীর কেশের কলাপ
আলো করে বসো কিংবা কর্ণে হও দুল ।

সোহাগে গলিয়া তুমি হও বা আতর
গুল্ফাসনে বসে কর বেগম কাতর।
বিলাসের অঙ্গ লাগি হও তুমি জল
নারীর আদুরে ফুল সৌখীন গোলাপ
নবাবেরি ভোগ্য তব রূপগুণ বল
নবাবের যোগ্য তুমি হকিমী জোলাপ।

সত্যেন্দ্রনাথে এই বক্র ব্যঙ্গদৃষ্টি নেই। তাঁর গোলাপ তাই রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতির অনুসরণে পরিণত। মরুভূমির গোলাপ মানুষের ভালোবাসার রঙে-রসে রঙিন ও সৌরভময় হয়ে উঠেছে—কণ্টক পরিণত হয়েছে ভুবনলোভন পেলবতায়—

মানুষের প্রেমে আজি সফল জীবন
দুঃখ আর নাহি এক রতি,
গরবী গোলাপ আমি ভুবন-লোভন,—
কণ্টকের আমি পরিণতি

—গোলাপ

পদ্মফুল নিয়ে লেখা অনেকগুলি কবিতার কোনো কোনোটিতে সূর্য ও পদ্মের মামুলী প্রেম-সম্পর্কই বিবৃত হয়েছে। কোথাও কবির প্রাণকেন্দ্রের শক্তিসাধনা পদ্মের সূর্যব্রতের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে কিঞ্চিৎ অভিনবত্ব লাভ করেছে—

মাটির সঙ্গে বাঁধা আছি আমি
আছি গো জলের সাথে,
তবু আলোকের অভিসারে করি
যাত্রা তিমির রাতে।

—নীলকমল

'কোথাও সূর্যহীন মেঘাবৃত দিনে বিনষ্টপ্রায় স্থলপদ্মের কুঁড়ির মৃত্যুঞ্জয়ী' হাসি দেখে কবিচিত্ত উল্লাস অনুভব করেছে,—

ফুটিলে না তবু ঝরিবে
মুকুল জীবনে মরিবে
অস্ত-ক্ষণের ক্ষণিক কিরণে
তবু মৃদু হাসি উঠিছে ভাসি!

একি আকুলতা! পুলকে
দুলিছে সাঁঝের আলোকে!
মেঘের নয়ন এল ছলছলি,
তবু তুমি একি হাসিছ হাসি!

—একটি স্থলপদ্মের প্রতি

তবে 'নীলপদ্মে'র ক্ষুদ্র অবয়বে তীব্র সৌন্দর্যবোধ এবং কোমলে কঠিনের ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টির ক্ষমতা বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছে—

আমি দেবতার অনিমেষ আঁখি জেগে আছি দিনযামি,
আমি কামনার নীল শতদল মর্ত্ত্যে এসেছি নামি!
সৌরভে মম অকূল পাথারে নাবিকেরা পায় দিশা,
সূর্য-পরাগ গর্ভে ধরেছি আমি সুনিবিড় নিশা।

ফুলের স্বভাবকোমলতায় বীর্যকাঠিন্য সৃষ্টির প্রবণতা অন্যত্রও কবি দেখিয়েছেন। নীলপদ্মকে তাদের শ্রেণীভুক্ত করাই সঙ্গত।

কদম্বের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে পরিচিত ভাবাসঙ্গ জড়িত তারই অনুসরণ করেছেন কবি, রূপরচনা সফল হওয়ায় উপভোগ্যতার হানি ঘটে নি। কুমুদের চন্দ্রপ্রীতির কাব্যিক ধারণাকেই সত্যেন্দ্রনাথ একটি ক্ষুদ্র সহজ এবং আবেদনপূর্ণ কবিতায় ধরে রেখেছেন।

অশোকফুল নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। কবিদৃষ্টির বর্ণবিলাস সে কবিতায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে—

কোথায় সিন্দুর গাঢ়—সধবার ধন ?
আবীর কুঙ্কুম কোথা গোপিনী বাঞ্ছিত ?
কোথায় সুরীর কণ্ঠ আরক্ত-বরণ ?
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ লোহিতে রঞ্জিত ?
কোথায় বা ভাঙ্গে—রাঙা রুদ্রের লোচন ?
কোথা গিরিরাজ—পদ অলক্তে মণ্ডিত ?
মদন-বধূর কোথা অধরের কোণ—
ব্রীড়ার বিক্ষেপে হায় সতত লোহিত ?
সকলেরই কিছু কিছু চারুতা আহরি
ধরি রাগ অপরূপ গাঢ় ও তরল,
গুচ্ছে গুচ্ছে তরুরে করিয়া উজ্জ্বল
রাজিছে অশোকফুল মরি কি মাধুরী !

এ কবিতা চোখের আনন্দ, সত্যেন্দ্রনাথের অশোক শ্রবণমনোহর। ছন্দনৃত্য ও শব্দঝঙ্কার একটি যৌবনজয়ের শোক উত্তরণের বাণীও সঞ্চারিত করেছে এই ক্ষুদ্রদেহ কবিতাটিতে—

মুকুলভোজী কোকিল এল কুঞ্জে !
ভ্রমর পাঁতি দিবস রাতি গুঞ্জে !
মুঞ্জরিয়া উঠিনু মোরা হর্ষে
অরুণ রাগে তরুণ আলো স্পর্শে !
এসেছে পিক অরুণ তার নেত্র !
অশোক ফুলে অরুণময় ক্ষেত্র !
শীতের সাথে শোকের স্মৃতি নষ্ট
তরুণ আজি,—ছিল যা কীটদষ্ট ;

কিঞ্চিৎ চটুলতা আছে ছন্দে ও বাণীবিন্যাসে, নবীন প্রাণের চাঞ্চল্যের দ্যোতনা আনায় তার প্রয়োজন ছিল।

'মহুয়া ফুল' কবিতায় স্বর্ণবর্ণ সরসতার উপরই গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, মদিরতার কথা প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে মাত্র, কবিতার ভাষায় তার রসাবেদন প্রাণ পায় নি। 'কাশফুল' শরতের খুশির হাওয়া ও ছুটির মেজাজ নিয়ে রবীন্দ্রকাব্যে প্রায় প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়ও ভাবগত কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। তবে ধরার 'ধৃত-তুলি অঙ্গুলি' বাতাসের বুকে 'কাশের ক্ষুদ্রতুলি' বুলিয়ে 'জ্যোৎস্নার রং ফলাতে' চায়, রাতারাতি কাজল মেঘকে তারা সুধা ধবলিত করে দেবে—এরূপ চিত্র ও শব্দব্যূহ রচনার বিশিষ্টতা সৌন্দর্যবহনে ব্যর্থ হয় নি। 'পারিজাত' একটু স্বতন্ত্র জাতের কবিতা। পারিজাত প্রকৃতিজগতে ফোটে না, মানুষের আদর্শ কল্পনারাজ্যে এর স্থান, মানবজীবনের কাম্য ধনের অপর নাম পারিজাত—একে পাবার জন্য—মানুষের সাধনার বিরাম নেই, কিন্তু কোনদিনই প্রাপ্তির মধ্যে একে আয়ত্ত করা যায় না। কবিতাটি একান্ত সৌন্দর্যরহিত নয়, তবে আদর্শ সৌন্দর্যের জন্য মানবপ্রাণের চিরন্তন আর্তির যে সুর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সঙ্গীত বাজিয়েছে তার প্রতিধ্বনি এখানে প্রাপ্তব্য নয়।

একান্ত অখ্যাত বা অবজ্ঞাত, আকারে ক্ষুদ্র, গৌরবে দীন ফুলেদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথও দুচারটি কবিতা লিখেছিলেন। সেখানে তুচ্ছ কুরচি, কণ্টিকারীতে নিখিলের নিশ্বাস কম্পিত হয়েছে। কুমুদ-রঞ্জনের কবিতার নির্বাচন প্রধানত ক্ষুদ্র, অপরিচিত গ্রাম্য ফুলেদের প্রতি ধাবিত হয়েছে। কবির বিশেষ চিত্তপ্রবণতা এর মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবি-মনে ক্ষুদ্রবস্তু স্তিমিত ভাবাবেগ বা

গ্রাম্য পরিবেশের প্রতি কোনোরূপ আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু লঘুতরল খেয়ালী কল্পনার কাছে তিনি সুগভীর চিত্তোদ্বেলতা, মদির ভাবানুভূতিকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তৃণমঞ্জরী, জুঁই, বকুলের মত কবিতায় তিনি তরল মৃদুরসের আয়োজনে এক বিশেষ ধরনের সাফল্য দেখিয়েছেন। তাঁর কল্পনায় তৃণকুসুম—

আছি দেশ ভরি তৃণমঞ্জরী
হরষের বুদ্‌বুদ্‌,
ফুরতির ফাউ—ফালতো আদায়,
না-চাহিতে পাওয়া সুদ।

—তৃণমঞ্জরী

এই স্ফূর্তির চাঞ্চল্য পারুলের সোনার রঙে ছন্দাহিল্লোলের দোলা দিয়েছে—

সোনার কেশর, পাপড়ি সোনার, সোনার কলেবর,
পারুল! তোরে গড়েছে কোন্ ঢাকাই কারিগর?

'বকুল', 'কুন্দ', 'জুঁই' প্রভৃতি কবিতায় মৃদু মাধুর্যের স্পর্শ লেগেছে। 'হাস্নুহানা'য় অবশ্য স্নিগ্ধ মদিরতার একটু অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। 'ভুঁইচাঁপা'র রূপে তবল আনন্দ-বিস্ময় ধরা পড়েছে—

কৌতূহলী কেকাধ্বনি মূর্তি ধরে—
ফুটল সে ভুঁইচাঁপা হয়ে মাটির পরে।
বিস্ময়েরি বোল্ বেজেছে,—
বিনা-ডালেই ফুল সেজেছে!—
ওই লুপ্ত গাছের গোপন মূলে কী মন্তরে!

সত্যেন্দ্রনাথ সবচেয়ে বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন যৌবনশক্তির কাঠিন্যকে ফুলের স্বাভাবিক পেলবতার মধ্যে

আবিষ্কার করায়। চিরাচরিত কোমলতা, রোমান্টিক লালিত্য-জড়িত পুষ্পভাবাসঙ্গের বিরুদ্ধতা সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলিতে লক্ষণীয়। ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তও এই সব কবিতার রুদ্র রূপের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর 'কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কাব্যের প্রথম পর্যায়' গ্রন্থে।

রৌদ্রবর্ণ গাঁদাফুলকে কবি বলেছেন 'সূর্যমল্লিকা,' কিন্তু এ কবিতার ছন্দে সংহতিহীন চপলতা প্রাধান্য পাওয়ায় রুদ্রপ্রকৃতির যথার্থ প্রতিফলন ঘটে নি। মদির সৌন্দর্যের তীব্রতা ও বীর্য চমৎকার সমন্বয় লাভ করেছে 'চম্পা' কবিতায়। 'উগ্র মগুসম রৌদ্রে' তার তৃষ্ণার নিবৃত্তি, সূর্যের বিভূতিকে সে লাবণ্যে রূপান্তরিত করে তনুভরে গ্রহণ করেছে, 'সূর্যের সৌরভ'রূপিণী সাহসিকা অপ্সরা সে। গ্রীষ্মশোষণক্লিষ্ট বনানীর রুদ্র তপস্যার দিনে তার আবির্ভাব। এ সৌন্দর্যে মদনদেবতার অর্ঘ্য যদি বিরচিত হয়েও থাকে, তবুও শব্দচয়ন ও বাকবিন্যাস দেখে না বলে উপায় নেই, অতনু এখানে বীরের তনুতে তনুলাভ করেছে। এমন নিটোল, সংহত, তীব্র ও মার্জিত কবিতা যে কোনো বড় কবির গর্বের সামগ্রী। 'শিরীষ' অবশ্য রৌদ্রের রুদ্রদাহনকে আত্মসাৎ করতে পারে নি, কৃচ্ছ্রসাধনে জীবন তার সমাপ্ত প্রায়, কিন্তু মরণের বুকে জেগে থাকে তার অমৃত আশা—

মাথার উপরে সূর্য জ্বলিছে
　　ঘিরিয়া রয়েছে তপ্ত হাওয়া
কৃচ্ছ্র সাধন জীবন আমার
　　শান্তি কোথাও গেল না পাওয়া।
চিতার অনলে অরুণ আরাম,
　　মরণের বুকে অ-মৃত আশা।

'আকন্দের' প্রস্তরীভূত কঠিন রূপে নীলকণ্ঠের বিষজর্জর কণ্ঠের আলিঙ্গনের ভাবাসঙ্গ সুপ্রযুক্ত—

স্ফটিকের মত শুভ্র ছিলাম
আদিম পুষ্পবনে,
নীল হয়ে গেছি নীলকণ্ঠের
কণ্ঠ-আলিঙ্গনে !

'আফিমের ফুলে' মৃত্যুর ভাবনা আরও তীব্র। ফেনিল মরণরস মন্থন করে যেন পুষ্পরূপ পেয়েছে সে, লীলাকোমল ফুলেদের সব সৌন্দর্যের আয়োজন তার কাছে ব্যর্থ। সে বিষ-বুদ্বুদ্, বিপদের রক্ত-নিশান উড়িয়ে তার আগমন। 'কনক ধুতুরা'র বিষপূর্ণ স্বর্ণবর্ণ দেহপাত্রেও মৃত্যু-সাধনার চিত্র দেখেছেন কবি এবং উত্তেজিত হয়েছেন—

সোনার গেলাসে মুগ্ধ মদিরা !—
কর্ণে কী কথা জপে।
ফেনগুঞ্জনে মত্তলোচনে
মৃত্যুর হাসি সঁপে !

তবে 'কেতকী'র সাধনা-বিষের রাজ্যে বাস করেও মৃত্যু-উত্তীর্ণ হবার, 'কণ্টকের কুণ্ঠায়' অবসিত না হয়ে 'সৌরভের গৌরব' প্রকাশের আর 'জবা'য় মৃত্যুরূপা প্রকৃতির ধ্বংসশক্তি প্রতিনিবৃত্ত করবার আকুল মানবীয় কামনার পুষ্পরূপ দেখেছেন কবি,—

আমারে লইয়া সুখী হও তুমি ওগো দেবী শবাসনা !
আর খুঁজিয়ো না মানব-শোণিত আর তুমি খুঁজিয়ো না।
আর মানুষের হৃৎ-পিণ্ডটা নিয়ো না খড়্গে ছিঁড়ে,
হাহাকার তুমি তুলো না গো আর সুখের নিভৃত নীড়ে।
এই দেখ আমি উঠেছি ফুটিয়া উজলি পুষ্প-সভা,—
ব্যথিত ধরার হৃৎপিণ্ড গো আমি সে রক্তজবা।

॥ চার ॥

সত্যেন্দ্রনাথকে অধিক আকর্ষণ করেছে সমুদ্র, পর্বত নয়। প্রকৃতির মহান, উদার ও বিপুল সৃষ্টি হিসেবে এরা পরস্পর তুলিত হবার যোগ্য ; কিন্তু শুধুমাত্র বিপুলতায় সত্যেন্দ্রনাথের কবিচিত্ত সাড়া দিত না। মৌন গম্ভীর মহিমার প্রতি তাঁর তত শ্রদ্ধা ছিল না। সমুদ্রের বিপুল গাম্ভীর্যের সঙ্গে স্থাণুত্বের যোগ নেই, অশ্রান্ত উদ্বেলতা একে প্রাণ-চাঞ্চল্যে পূর্ণ করে রেখেছে। হিমালয় প্রসঙ্গে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাগুলি প্রধানত দার্জিলিঙের শৈলাবাস থেকে লেখা। উল্লেখ-যোগ্য রচনা হিসেবে নাম করতে হয় 'হিমালয়াষ্টক', 'কাঞ্চনশৃঙ্গ', 'মেঘলোকে', 'দার্জিলিঙের চিঠি', 'চূড়ামণি', 'হরমুকুট গিরি' প্রভৃতি কবিতার।

'হিমালয়াষ্টক' কবিতায় কবি আন্তরিকতার সঙ্গে মহামৌন পর্বতরাজের মহিমা-মূর্তি আঁকতে চেয়েছেন, তথ্যচয়ন ও পুরাণ-কথা থেকে নিজেকে সংযত রেখেছেন সযত্নে। কিন্তু সে চেষ্টা সফলতা পায় নি। এক বিপুলদেহ পুরুষের আভাস চিত্রকল্পগুলির মধ্য থেকে উঁকি দিয়েছে, কিন্তু পূর্ণরূপে দানা বাঁধে নি। কবি তাঁর সাধ্যের সীমা বুঝতে পেরে এজাতীয় সাধনায় আর কালক্ষেপ করেন নি। হাল্কা খুশিতে মেঘের দলের সঙ্গে আকাশ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন—

মেঘেরা যেখানে দূর হতে শুধু,
বৃষ্টি মারে না ছুঁড়ে,
পাশাপাশি হাঁটে মানুষের সাথে,—
পড়ে থাকে সানু জুড়ে ,
কখনো দাঁড়ায় ভঙ্গী করিয়া
কীর্তনিয়ার মত,—

কেহ মৃদঙ্গে করে মৃদু ধ্বনি,
কেহ নর্তনে রত !···
কৌতুকে মিহি চাঁদের সূতার
ওড়না ওড়ায় কেহ,
তারি ভারে তবু পলে পলে যেন
ভাঙিয়া পড়িছে দেহ !

—মেঘলোকে

কখনও দার্জিলিঙের উচ্চতা নিয়ে বালসুলভ চপলতা প্রকাশ করেছেন—

আমি এখন বসে আছি সাতশো-তলার ঘরে !
বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে।
ফিরোজা রং আকাশ হেথা মেঘের কুচি তায়,
গরুড় যেন স্বর্গপথে পাখ্‌না ঝেড়ে যায়।

—দার্জিলিঙের চিঠি

অথবা নানা তথ্যবিবৃতির আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন (চূড়ামণি); 'কাঞ্চনশৃঙ্গে'র বর্ণনায়ও উচ্চতায় বিস্ময় প্রকাশ করা হলেও যথার্থ ভাবগাম্ভীর্যের স্পর্শমাত্র লাগে নি, লঘুতার আমেজ এরও সর্বাঙ্গে।

('পুরীর চিঠি', 'সমুদ্রাষ্টক', 'পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি', 'সিন্ধুতাণ্ডব', 'অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি', 'সমুদ্র-পান', 'স্বর্গদ্বারে'—সমুদ্রবিষয়ক অধিকাংশ কবিতার উৎস পুরীর সমুদ্রতীর, এগুলি 'অভ্র-আবীরে' সঙ্কলিত।

"সমুদ্রাষ্টক" কবিতাটি সম্পূর্ণ সংহত ও একাগ্র হয়ে ওঠে নি। সমুদ্রকে কবি মহৎ, প্রবল, বৈচিত্র্যময় ও চঞ্চল বলে অনুভব

করেছেন। এই অনুভূতি একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিমূর্তিকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমর্থ হয় নি। কখনও তাকে মহৎ কবি বলে বর্ণনা করেছেন, কখনও তার মধ্যে রাজার বীর্য দেখেছেন, কখনও নদীনারীদের সঙ্গে তার নর্মলীলার কল্পনা করেছেন কবি। সমুদ্রের কবিস্বভাব তার বীর্যবন্ত ক্ষাত্ররূপের সঙ্গে সমন্বিত হয় নি। আবার শেষ স্তবকে মৌনী ঋষিরূপে সমুদ্রের চিত্রাঙ্কনের চেষ্টায় কবির রূপচেতনা বিচলিত হয়েছে। ক্বচিৎ বলদেব, মৈনাক প্রভৃতিকে আশ্রয় করে রূপকথার রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টাও প্রত্যাশিত সংহতি থেকে রচনাকে ভ্রষ্ট করেছে। কিন্তু ক্ষাত্রনৃপতির তেজোদ্দীপ্ত ও ঐশ্বর্যোজ্জ্বল মূর্তিটি শব্দের গাম্ভীর্যে এবং বর্ণের বিহ্বলতায় রূপসিদ্ধি লাভ করেছে—

সিন্ধু তুমি প্রবল রাজা, অঙ্গে তব প্রবাল-ভূষা,
যত্নে হেম-নিষ্ক-মালা পরায় তোমা সন্ধ্যা-ঊষা ;

সমুদ্রের প্রেমিক রূপের চিত্রাঙ্কনেও গাম্ভীর্যের কিছুমাত্র হানি ঘটান নি কবি, একটা স্বল্পবাক্ আভিজাত্য, শক্তিমানের প্রণয়-লীলা প্রকাশ পেয়েছে—

তমাল জিনি বরণ তব, অঙ্গে মরকতের দ্যুতি,
কর্ণে তব তরঙ্গিছে গঙ্গা-গোদাবরীর স্তুতি ;
নর্ম-সখী নদীর যত অধর সুধা হর্ষে পিয়ো
লাস্যগতি, হাস্যরতি সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

'সিন্ধুতাণ্ডব' কবিতায় সংস্কৃত পঞ্চচামর ছন্দের অনুসরণ করা হয়েছে। গম্ভীর বিপুলের প্রবল চাঞ্চল্যের সুরটি কবি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন এ কবিতায়। ছন্দের পরিপূর্ণ সুযোগ কবি গ্রহণ করেছেন একথা বিশ্বাস করা যায়। কবিতাটিতে সমুদ্রের তরঙ্গ দোলাকে আমন্ত্রণ করেছেন কবি। সামান্যত পুরাণকথায়

ইঙ্গিত থাকলেও কবি তাকে প্রশ্রয় দেন নি। কবিতাটির আবেদন শ্রুতির কাছে, চিত্র এখানে ধ্বনিতে বিগলিত ও তরঙ্গিত। মহেশ্বরের তাণ্ডবনৃত্যকে কবি প্রলয়-পিণাকের গুরুগম্ভীর শব্দে রূপান্তরিত করেছেন। সাল্লাইমের সঙ্গে প্রাণচাঞ্চল্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্কে কবিতাটি ধন্য হয়েছে।

'পুরীর চিঠি' কবিতায় কল্পনাব লঘু চাপল্য ও খেয়ালীপনা প্রকাশিত।—

নীল কাজলের তুলি আমার চোখে বুলায় কে রে!
যে দিকে চাই নিবিড নীলে নয়ন আসে ভরে!
মায়া-কাজল মন্ত্র-পড়া ভুল কিছু নাই তায়,—
মায়া-ভুবন মুক্ত হেরি তোমাব ডাহিন বাঁয়।
পাতাল-পুরীর সিংদরজায়, উছল ঢেউয়ের পাশে,
ময়াল-সাপের হুড়কা ঠেলে নাগবালাবা আসে;
মুক্তা-ঘেরা ঘোম্‌টা তুলে চোখ্‌ মেলে যেই তারা,
ভেঙে পড়ে বেলোয়ারী ঢেউ—ফেণা ফটিক পারা।

হিমালয়ের কোলে বা সমুদ্র তীরে কোথাও কবি তাঁর তরল কল্পনাপ্রবণ চিত্তটির খেলা না দেখে থাকতে পারেন নি। এসব ক্ষেত্রে বস্তুরস প্রত্যাশিত নয়, কবি-মনের খেলার চটুল আমোদটুকুই উপভোগ্য।

'স্বর্গদ্বারে' কবিতায় ধর্ম-বোধের সঙ্গে ইতিহাস-কথার উল্লেখ যুক্ত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের ধর্মচেতনায় গভীরতা নেই, মৌলিকতাও নেই। এজাতীয় কবিতা ছন্দনির্ভর বিবৃতির ঊর্ধ্বস্তরে উঠতে পারে নি।

সমুদ্রবিষয়ক কবিতায় সবচেয়ে সাফল্য এসেছে তিনটি সনেটে—'পুর্ণিমা-রাত্রে সমুদ্রের প্রতি', 'অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি' এবং

'সমুদ্র-পান' কবিতায়। আঠারো মাত্রার চরণ ব্যবহারে ভাবগাম্ভীর্য অনেকটা আয়ত্ত। ভাবরূপের নিপুণ সংহতি, শব্দচিত্রের বিস্ময়কর ব্যঞ্জনাধর্ম সমুদ্রের তরঙ্গকোলাহলের প্রবলতা ও গভীর গাম্ভীর্যকে প্রকাশ করেছে। তিনটি কবিতারই প্রারম্ভে সমুদ্রের ভাবব্যঞ্জিত বস্তুচিত্র স্থান পেয়েছে, শেষাংশে ভাবানুভূতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন কবি। প্রথম কবিতায় প্রেমিক সমুদ্রের রূপ অপরূপ হয়ে ফুটেছে,।

অপূর্ব শৃঙ্গার-বেশ আহা
আজি তব চিত্তহারী! জ্যোৎস্না-চন্দনের পত্রলেখা
শ্রীঅঙ্গে শোভিছে কিবা! অপরূপ তব অভিসার
আকাশে দেউটি জ্বালি!—কার লাগি?
কেবা জানে তাহা?

কিন্তু সমাপ্তির পংক্তিতে "ডেকে নাও, কোল দাও গৌরাঙ্গের মত একবার" ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে সহজ সঙ্গতি লাভ করতে পারে নি। দ্বিতীয় কবিতায় সমুদ্রের বস্তুরূপ প্রথমাবধিই ভাবতরঙ্গে আলোড়িত—

হে সমুদ্র! হে ভীষণ! অন্ধকারে আমি পথহারা;
দু চোখে ভেলার আঠা কী কুহকে গিয়েছে জড়ায়ে।
জোয়ারে ফুলিছ তুমি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে
গ্রাসিছ সৈকত-ভূমি তৃপ্তিহীন রাক্ষসের পারা।

দ্বিতীয় স্তবকে অন্ধকারে সমুদ্রের বস্তুরূপের ভীষণতা শব্দচিত্রে সার্থক হয়ে উঠেছে। ষড়কে কবি নিজ ভাবানুভূতি প্রকাশ প্রসঙ্গে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ভাষার বিবৃতিধর্ম রচনার সর্বাঙ্গীন সফলতাকে বিঘ্নিত করেছে। 'সমুদ্র-পান' কিন্তু ত্রুটিহীন। এ কবিতার প্রথম স্তবকে সমুদ্রের যে রূপকল্পনা ভাষামূর্তি পেয়েছে তার অভিনবত্ব এবং বীর্য-স্তম্ভিত মাহাত্ম্য লক্ষ্য করবার

মত। কবি 'ইন্দ্রনীল-নীলাম্বর-সাথী', 'স্বর্গের বারুণী সুরা', 'যোদ্ধ-দেবতার বীরপান', 'দ্রবীভূত অন্ধ অমারাতি' বলে সমুদ্রকে সম্বোধন করেছেন। এমন কি তাঁর অতিপ্রিয় পুরাণ-প্রসঙ্গও এক্ষেত্রে তাঁকে কেন্দ্রভ্রষ্ট করতে পারে নি। পুরাণকথাকে রসরূপে তিনি রূপান্তরিত করেছেন—'ক্ষুদ্র দেহে রুদ্র মোরা সিন্ধুগ্রাসী অগস্ত্যের জাতি'। কবির ভাবানুভূতিটি খুব কিছু অভিনব না হলেও প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতায় বীর্যস্ফুরিত যৌবনধর্মের দ্যোতক হয়ে উঠেছে—

সর্ব-রস-রত্নাকরে পিয়ে লব একটি গণ্ডূষে,
পূর্ণ হব সর্ব রসে বজ্র-গর্ভ মেঘের মতন ;
সমুদ্রের মহাদ্রোণী পরিণত করি রিক্ত তুষে
উদ্ঘাটিব পাতালের বিচিত্র প্রবাল-কুঞ্জবন ;
শূন্য --পরিপূর্ণ হবে সপ্ত সাগরের সার শুষে—
আহরিব আত্মা-মাঝে অমূর্ত সমুদ্র অসেচন !

(সমুদ্রপ্রসঙ্গে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাপাঠে কয়েকটি বিশিষ্টতা চোখে পড়ে।)

এক। (সমুদ্রের বস্তুরূপ কবির অন্তরাত্মাকে মুগ্ধ করেছে। না হলে এত বেশি সংখ্যক কবিতায় সাফল্য সম্ভব হত না। পর্বতেও অচল মৌন, জড়ত্বের বোধ এনেছে। তার মধ্যের Sublime কবিচিত্তকে স্পর্শ করতে পারে নি। সমুদ্রের রূপচিত্রাঙ্কনে কবি Sublime-এর রাজ্যে মাঝে মাঝে পৌঁছেছেন। সম্ভবত সমুদ্রের তরঙ্গিত চাঞ্চল্য ও মহাকোলাহল কবিকে আকর্ষণ করেছে। বস্তুর স্থিতি নয়, গতিই সত্যেন্দ্রনাথের কাম্য। গতিশীল বস্তুর প্রাণস্রোত তাঁর রচনায় অধিক সার্থক।

দুই। কবি সমুদ্রের বস্তুচিত্র এঁকেছেন। কবির কল্পনা বস্তুধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। সনেট তিনটিতে কবির ব্যক্তি-অনুভূতি কিছু প্রাধান্য পেয়েছে। তবুও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সমুদ্রের বিপুলতা, গভীরতা, ভীষণতা ও পৌরুষব্যঞ্জক সৌন্দর্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন কবি। আপন ভাবানুভূতিকে তা থেকে দূরে যেতে দেন নি। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা সমুদ্রকে জননীতে রূপান্তরিত করেছে।

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে।
তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গ বন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।

সে কল্পনার এমন পরিপাক শক্তি আছে যাতে সে চিত্রও সাফল্যের উচ্চস্তরে আসন পেয়েছে। রবীন্দ্র-প্রকৃতি-চেতনার সমগ্রতা এ ক্ষেত্রে প্রকাশিত। নিসর্গবস্তু শুধু বস্তুমহিমায় নয়, প্রধানত কবির সুগভীর জীবন ও বিশ্ববোধজাত কল্পনায় জড়িত হয়ে নব সত্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'মানসী'তে (রবীন্দ্রনিসর্গচেতনার বিশিষ্টতা তখনও পরিণত নয়) 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় সমুদ্রে, ঝড়ে যাত্রীদলের ধ্বংসের চিত্র এঁকেছেন কবি। এ কবিতার কিছু প্রভাব আছে সত্যেন্দ্রনাথের 'সিন্ধু তাণ্ডব' কবিতায়। তবে রবীন্দ্র-নাথের কবিতায় জড় প্রকৃতির অন্ধ আক্রোশ এবং মানবপ্রাণের প্রীতির মধ্যেকার চিরন্তন দ্বন্দ্বের দার্শনিক উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে।—

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা।
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথাভরা স্নেহময়
মানবের মন।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়ও তার কিঞ্চিৎ ছায়া পড়েছে—

জতুর পুতুল বসুন্ধরায়
ও নীল মুঠার জানাও পেষণ!

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুগভীর দার্শনিকতা সত্যেন্দ্রনাথে প্রত্যাশিত নয়।

তিন। নজরুলের কবিপ্রতিভাব সঙ্গে সমুদ্রের এক ধরনের সহমর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের কবিপ্রাণ সমুদ্রনৈকট্যে এক ধরনের উল্লাস বোধ করত। সিন্ধুকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন—

হে ক্ষুধিত সিন্ধু মোর তৃষিত জলধি,
এত জল বুকে তব
তবু নাহি তৃষ্ণার অবধি।
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,
বুভুক্ষু, তবু কি ভরিল না প্রাণ?

নজরুলের আবেগপ্রবলতা সত্যেন্দ্রনাথে নেই। সত্যেন্দ্রনাথে আবেগ স্তম্ভিত হয়ে আছে, নজরুলের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি।

চার। সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনায় সমুদ্র রুদ্ররূপী পুরুষ-মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। ক্বচিৎ রুদ্রের তাণ্ডবের তাল তার তরঙ্গে অনুভূত হয়েছে। কখনও বরবেশে, কখনও নদীবধূদের সঙ্গে নর্মলীলারত

সমুদ্র-পুরুষকে কবি দেখেছেন। কিন্তু বীর্যবন্ত পৌরুষ প্রায় সর্বত্র অবিচল থেকেছে।

'পদ্মার প্রতি', 'গঙ্গার প্রতি', 'শোণ নদের প্রতি', 'যুক্তবেণী', 'মহানদী', 'রূপনারায়ণ' প্রভৃতি কবিতায় নদীর কথা বলেছেন কবি। ছয়টি স্তবকে গঙ্গার যে ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন কবি, তার মধ্যে যুগ যুগ ধরে অনুভূত ভারতবাসীর ভক্তিপ্রাণতা একটা কোমল প্রশান্ত ভাবব্যঞ্জনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ভাবানুভূতিতে মৌলিকতা বা কল্পনাতিরেক নেই। প্রত্যক্ষ দৃশ্য এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় ধর্মচেতনাকেই কবি আশ্রয় করেছেন। শোণনদী প্রসঙ্গে কবি প্রথম স্তবকে চিত্ররচনার সামান্য চেষ্টা করে তথ্য-নিষ্ঠার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। 'যুক্তবেণী' কবিতায় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের রূপ বর্ণনা অপেক্ষা পৌরাণিক ভাবপরিবেশ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাই প্রাধান্য পেয়েছে। গঙ্গানদীর সঙ্গে মহাদেবের ভস্মাচ্ছাদিত দেহ এবং যমুনার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ভাবাসঙ্গ বিজড়িত করে দেখতে চেয়েছেন কবি। রূপনারায়ণ'-এ ভক্তিপ্রাণতা প্রাধান্য পেলেও একটি প্রশান্ত বিস্তৃতদেহ নদীর দেবকল্প গম্ভীর সৌন্দর্য অপ্রকাশিত থাকে নি—

কান্ত তুমি সমুদ্রের প্রায়,
শান্ত দেবতার মত, আকাশেরে চুম্বিছ লীলায়
হে বিপুল! কণ্ঠে তব সন্ধ্যার মন্দার-উপায়ন!
অঙ্গে সমুদ্রের মুদ্রা—সঙ্গে উপনদীদের পুঁজি;
ত্বরাহীন তন্দ্রাহীন চলিয়াছ তট চুমি চুমি।
আকাশের ছবি বুকে,—তুমি যেন আকাশেরি আধা,
মহাশান্তি মহাব্যাপ্তি আত্মার সতীর্থ তুমি বুঝি।

'মহানদী'র সনেট-আঙ্গিকেও স্বচ্ছন্দ কবি যৌবনশক্তির উদ্বোধনের স্বপ্ন দেখেছেন। বর্ষায় উদ্দাম নদীর রূপাঙ্কনে কবির চিত্তোদ্বেলতা সাফল্যের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে।

তবে 'পদ্মার প্রতি' নদীবিষয়ক কবিতাগুচ্ছের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পদ্মার বিদ্রোহিনী নারীরূপের একটি সংহত চিত্র কবিতাটিতে আদ্যন্ত অনুসৃত হয়েছে। এই ভাবচিত্র অবশ্য পদ্মার বস্তুরূপের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। সমুদ্রের যোগ্য সহচরী বলে এই নদীকে কল্পনা করেছেন কবি, প্রলয়ঙ্করী, ভীষণা, ভৈরবী-সুন্দরী, প্রগল্‌ভা, প্রবলা, দুর্দমিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন-গম্ভীর বলে সম্বোধন করেছেন। এতগুলি সুনির্বাচিত, ধ্বনিঝঙ্কারময় বিশেষণ-শব্দের প্রয়োগে সমুদ্রপ্রেয়সী নদীর স্বরূপ প্রাণবন্ত করেছেন কবি, কিন্তু কোথাও কবিতা তথ্যভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে নি। বিস্ময়কর সংযমের সঙ্গে কবি এই পুরাণকাহিনীর নির্যাসটুকু গ্রহণ করে তাঁর কল্পনাব পদ্মার রূপকেই আরও তীব্র করে তুলেছেন—

শিশুকাল হতে তুমি উচ্ছৃঙ্খল, দুরন্ত-দুর্বার ;
সগর রাজার ভস্ম করিলে না স্পর্শ একবার।
স্বর্গ হতে অবতরি ধেয়ে চলে এলে এলোকেশে,
কিরাত-পুলিন্দ-পুণ্ড্র অনাচারী অন্ত্যজের দেশে!
বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন-মনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজ পথ,

অনার্যের প্রাণচাঞ্চল্যের সঙ্গে পদ্মার সর্বধ্বংসী রূপের সহজ সম্বন্ধ আবিষ্কার করেছেন কবি। সর্বশেষে পদ্মার বিধ্বংসী শক্তির মধ্যে সুপ্তিভঙ্গের সঙ্গীত শুনে কবির চিত্ত উদ্বেলিত হয়েছে।—

ধনী দীনে একাসনে বসায়ে রেখেছ তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটিরে ;
না জানে সুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে,
ভাঙনের মুখে বসি গাহে গান প্রলয়ের তানে,
নাহিক বাস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই !
অয়ি স্বাতন্ত্র্যের ধারা ! অয়ি পদ্মা ! অয়ি বিপ্লাবিনী !

পঞ্চম অধ্যায়

পরীর মেলায়

ঐ দেখো, মাঠের মাঝখানে, কোথাও কিছু নাই, একটা ঘূর্ণা বাতাস খানিকটা ধূলা এবং শুক্‌নো পাতার ওড়্‌না উড়াইয়া কেমন চমৎকারভাবে ঘুরিয়া নাচিয়া গেল। পদাঙ্গুলি-মাত্রের উপর ভর করিয়া দীর্ঘ সরল হইয়া কেমন ভঙ্গীটি করিয়া মুহূর্তকাল দাঁড়াইল, তাহার পর হুস্‌হাস্‌ করিয়া সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। সম্বল তো ভারি! গোটাকতক খড়কুটা সুবিধামতো যাহা হাতের কাছে আসে তাহাই লইয়া বেশ একটু ভাবভঙ্গী করিয়া কেমন একটি খেলা খেলিয়া লইল।......না-আছে তাহার কোনো উদ্দেশ্য, না-আছে তাহার কেহ দর্শক! না-আছে তাহার মত, না-আছে তাহার তত্ত্ব; না-আছে সমাজ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অতি সমীচীন উপদেশ! পৃথিবীতে যাহা-কিছু সর্বাপেক্ষা অনাবশ্যক, সেই সমস্ত বিস্মৃত পরিত্যক্ত পদার্থগুলির মধ্যে একটি উত্তপ্ত ফুৎকার দিয়া তাহাদিগকে মুহূর্তকালের জন্য জীবিত জাগ্রত সুন্দর করিয়া তোলে!

—রবীন্দ্রনাথ : পঞ্চভূত

॥ এক ॥

কাব্যকল্পনায় High Seriousness-ই উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কবিদের একমাত্র কাম্য ছিল। হাস্যরসের চর্চা ব্যতীত কবিতায় লঘুতার ছিল প্রবেশ নিষেধ। হাসিকে উঁচুস্তরের জীবন-বোধের

বিরোধী বলেই মনে করা হত। গাম্ভীর্য মাত্রই গৌরবের এই ধারণার পরিবর্তন সূচিত হল বিংশ শতকে। গাম্ভীর্য হল মূর্খের মুখোশ—এরূপ বিদ্রোহবাণী উচ্চারণেও চিন্তাবিদেরা দুঃসাহস দেখাতে শুরু করলেন। এই বাংলা দেশেও সত্যেন্দ্রনাথের সমকালে এরূপ একটি আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী এর প্রবক্তা। সারহীন চুটকির সমর্থন জানালেন তিনি কবিতায় এবং প্রবন্ধে।

সাহিত্য জ্ঞানবিস্তার ও নীতিশিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে না এ সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধেও আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বভাব-ধর্ম বিষয়ে যে কথা বলেছেন তা গভীর ভাবানুভূতি ও সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে যুক্ত। প্রমথ চৌধুরীও রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যের উদ্দেশ্য থেকে প্রয়োজনকে নির্বাসিত করেছেন, কিন্তু লঘু রূপের ক্ষণিক আনন্দকে মর্যাদা দেবার পক্ষ তিনি গ্রহণ করেছেন। 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, '…এ কথা অস্বীকার করার জো নেই যে, যখন এ জগতে দশটা দিক আছে তখন সেই সব দিকেই গতায়াত করবার প্রবৃত্তিটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মন উঁচুতেও উঠতে চায়, নীচুতেও নামতে চায়। সত্য কথা বলতে গেলে সাধারণ লোকের মন স্বভাবতঃই যেখানে আছে তারই চারপাশে ঘুরে বেড়াতেও চায়, উড়তেও চায় না, ডুবতেও চায় না। কিন্তু সাধারণ লোকে সাধারণ লোককে কি ধর্ম, কি নীতি; কি কাব্য সকল রাজ্যেই অহরহ ডানায় ভর দিয়ে থাকতেই পরামর্শ দেয়। একটু উঁচুতে না চড়লে আমরা দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়ন-মন আকর্ষণ করতে পারি নে। বেদীতে না বসলে আমাদের উপদেশ কেউ মানে না, রঙ্গমঞ্চে না চড়লে আমাদের অভিনয় কেউ শোনে না। সুতরাং জনসাধারণের চোখের সম্মুখে থাকবার

লোভে আমরাও অগত্যা চব্বিশ ঘণ্টা টঙে চড়ে থাকতে চাই, কিন্তু পারিনে।...গান করতে গেলেই যে সুর তারায় চড়িয়ে রাখতে হবে, কবিতা লিখতে হলেই যে মনের শুধু গভীর ও প্রখর ভাব প্রকাশ করতে হবে, এমন কোনো নিয়ম থাকা উচিত নয়।"

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর মনের আংশিক মিল ঘটে থাকবে। তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যে লঘুসুরের কবিতা রচনার আগ্রহ প্রাধান্য পায় নি। 'কুহু ও কেকা' থেকে নানা প্রসঙ্গে এই চটুল মনোভাব ছায়া ফেলেছে এবং আরও পরবর্তীকালে কবির কাব্যের একটি প্রধান ধারায় পরিণত হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষকে, কাব্যভাত করবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞান ও চিন্তার বিষয়কে ছন্দে সমর্পণ করে কবিতা করে তুলতে তাঁর সমধিক আনন্দ। যেখানে কবি সার্থক কবিতা রচনা করতে পেরেছেন সেখানে কল্পনার লীলা কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে নি। কবি কাব্যকল্পনার ডানায় ভর করে সৌন্দর্যের তীর্থাভিমুখে যাত্রা করেন নি, অথবা অস্পষ্ট রহস্যাতুরতা অনুভব করেন নি। এই জাতের কল্পনা অর্থাৎ Poetic imagination-য়ে সত্যেন্দ্রনাথের অধিকার ছিল না। Serious কল্পনাব মধ্যেও এমন এক ধরনের অনিবার্যতা আছে যাকে অবিশ্বাস্য রূপকথার রাজ্যে নির্বাসন দেওয়া চলে না। Imagination-এর মধ্যে বাস্তবতার অস্বীকৃতি নেই, পৃথিবীর মাটির সঙ্গে তার যেন মধ্যাকর্ষণের যোগ, আকাশের বায়ুমণ্ডলে তার মুক্তি হলেও জীবনেরও নিশ্বাসে তা সুরভিত। কিন্তু আর এক ধরনের কল্পনা আছে, তা যেমন লঘু তেমনি দায়িত্বহীন। বাস্তবকে

ভাবে রূপান্তরিত করবার শক্তি তার নেই, পারে না সে ধূলামুঠিকে সোনামুঠিতে পরিবর্তিত করতে, নিকটকে দূরের দীর্ঘনিশ্বাসে ভরে দেওয়া তার সাধ্যাতীত, বাস্তব ও কাম্যলোকের মধ্যে সুরের ইন্দ্রজালের সেতু রচনা করতে সে অপারগ। রূপকথার কল্পনার মধ্যে যেন কোন অনিবার্যতা নেই, দায়িত্ব নেই জীবনের প্রতি। কল্পনার বর্ণে জীবনকে সে বদলে দিতে পারে না বলেই যেন লঘু খেয়ালীপনার খুশীতে বস্তুকে এড়িয়ে যেতে চায়। লঘু তরল কল্পনাবিলাসকে খাঁটি কল্পনা বলা চলে না, এ একরকম বস্তুজগতকে ফাঁকি দিয়ে শূন্যে ফানুস ওড়ানো। সত্যকার রোমান্টিক কবি তাই এই পরীর রাজ্যে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন না, অথচ সত্যেন্দ্রনাথের মত প্রত্যক্ষ জগতে বিচরণশীল কবি এই লঘুতার মধ্যে আরাম পান। এ ঘটনা কি করে সম্ভব হল? বস্তু-জগতকে মায়া জগতে পরিণত কবতে অপারগ বলেই তার ভার কবিকে ক্লান্ত করে তোলে। তাব জন্যই কি এই তারল্যের মধ্যে কবির মুক্তির কামনা?

সত্যেন্দ্রনাথের নানান ধরনের কবিতায় এই খেয়ালীপনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কারণ কবির মনের একটি বিশেষ প্রান্তই এই সুরের চর্চা করেছে। কিন্তু যেখানে কবিতায় বস্তুলোকের প্রাধান্য, বক্তব্যের প্রত্যক্ষতাই অভিপ্রেত, উদ্দেশ্যমুখীতা অতি স্পষ্ট, সেখানে কল্পনাতারল্যের উপস্থিতি সমগ্র কবিতার মেজাজকে নষ্ট করে দেয়। তার পরিচয় পূর্বের অধ্যায়গুলিতে মাঝে মাঝে নেওয়া হয়েছে।

তবে যেখানে কবি নিষ্ঠার সঙ্গেই দায়িত্বহীন হতে পেরেছেন, বস্তুকে লঙ্ঘন কবার নেশায় যখন মত্ত হয়ে উঠেছেন—বস্তুর

দাসত্বে আপনার লঘু কল্পনাকে নিযুক্ত না করে তাকে লঘু হয়ে ওঠার স্বাধীনতা দিয়েছেন তখনই এক বিশেষ ধরনের সাফল্য এসেছে তাঁর কবিতায়। এ সাফল্য হয়ত জীবনের সমগ্রতাকে, তীক্ষ্ণ তীব্র গম্ভীর মৌলিক অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করার গুরুত্ব অর্জন করে না, কিন্তু একটা স্বল্পস্থায়ী হাল্কা রঙের আমেজ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

॥ দুই ॥

'পরী'র সঙ্গে 'অপ্সরা' শব্দের অর্থঘটিত কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু ভাবপরিবেশগত দুস্তর ব্যবধান। 'পরী' শব্দটি এবং এই শব্দের সঙ্গে জড়িত বিশেষ ভাবানুভূতি প্রজাপতির পাতলা ডানার ফুরফুরে আবহাওয়া যেন জীবন্ত করে তোলে। অপ্সরা শব্দটি প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির মধুর ও মদির ভাবাবেশকে ঘনীভূত করে, কোন লঘুতা যেন তার নাগাল পায় না। পরীরা প্রেমকে এবং সৌন্দর্যকে সামান্য স্পর্শ করে গেলেও লঘুতার সীমা অতিক্রম করে গভীরতার মূল্য লাভ করতে পারে না।

সত্যেন্দ্রনাথ পরীদের গান গাইতে ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'-কল্পনা তাঁর ব্যঙ্গবোধকেই জাগিয়েছে। তিনি প্যারোডী কবিতা 'সর্বশী' লিখেছেন। কিন্তু কল্পনার বালসুলভতায় লাল-নীল-সবুজ নানা পরীর রঙে চোখের তৃপ্তি ঘটিয়েছেন, তাদের ডানা এবং নূপুরের শব্দ কানে বাজিয়েছেন। এই কবিতাগুলির পেছনে কবির প্রাণের যে আকুতির বীজটুকু সক্রিয়, সমস্ত দায়িত্বহীনতার মধ্যেও যে জীবন-জিজ্ঞাসাটুকু প্রকাশিত 'সবুজ পরী'তে তা ধরা পড়েছে। কবি বলেছেন—

ঘাসের শীষে সবুজ ক'রে শিস দিয়েছ, সুন্দরী।
তাই উথলে হরিৎ সোহাগ কুঞ্জবনের বুক ভরি'!
যৌবনেরে যৌবরাজ্য
দেওয়া তোমার নিত্য কার্য,
পাঞ্জা তোমার শ্যামল পত্র নিশান তৃণ-মঞ্জরী।

অবশ্য কবি এই বক্তব্যটি প্রত্যক্ষ করে তুলে ধরায় কবিতাটির ভারহীন, দায়িত্বহীন রসের ভোজ কোথাও বাধা পায় নি। কারণ কবি সবুজ পরীর যৌবনের অভিষানের কথা যতটুকু বলেছেন তার চেয়ে কবিতাটির শব্দগুলিতে এবং শব্দ দিয়ে আঁকা ছবিতে সবুজের রঙ ধরিয়েছেন, প্রাণের উচ্ছল উজ্জ্বলতার লঘু আনন্দ তাই মুঠোমুঠো ছড়িয়ে দিয়েছেন কবি এই কবিতায় —সেখানেই এদের বিশিষ্টতা, এদের সাফল্য। 'জর্দাপরী'তেও রঙের খেলা—তবে সে-রঙে হীরা-মণিমাণিক্যের আলোকবিচ্ছুরণ ও বিদ্যুৎ-দীপ্তিই মুখ্য। জর্দাপরীর গায়ে 'হিরণ-জরির ওড়না', 'জমাট জরির বোর্কা', চুলে তার 'জোনাক পোকার হার' আর সোনার পায়ে 'জরির জুতো', চোখে তার আলেয়া জ্বলে। এই উজ্জ্বলতা কবির দৃষ্টিতে বিহ্বলতা আনে—

রূপবতীর রোষের মতন স্বর্ণ-সাঁঝে পূর্ণিমার
লাবণ্যে তার হয় সোনালী রজত অঙ্গ চন্দ্রমার?

'লালপরী' কবিতায়ও রঙ আছে। কিন্তু এ কবিতার প্রধান আবেদন চোখের কাছে নয়, স্পর্শেন্দ্রিয়কে এর শব্দগুলি নাড়া দেয়। একটা কোমলতার স্নেহজড়ানো স্পর্শকে ভাষায় প্রাণবন্ত করে তুলতে কবি সফল হয়েছেন, প্রাণখোলা আনন্দে যোগ দিয়ে লালপরীর বালিকামূর্তির কল্পনা করেছেন—

লাল পরীগো! লাল পরী! ইন্দ্রসভার সুন্দরী!
কখন আসিস্ কখন যাস্! কার গালে যে গাল বোলাস্!
কার ঠোঁটে যে ঠোঁট থুলি! কার হাতে পায় তুল্ তুলি—
ফোটাস্ রাঙা পদ্ম গো জান্‌বে তা কোন মন্দ গো।
তোর চুমাতে হয় যে লাল খোকা খুকীর হাত পা গাল,
আঙুলগুলি কুঙ্কুমের কিশোর কেশর তুল্য হয়,
দেয়ালা তুই তার ঘুমের তাই ঘুমে প্রফুল্ল রয়,…

'নীলপরী' কবিতাও সেই রঙ দেখার স্ফূর্তি, চিত্রের বিচিত্র আয়োজন এবং তার মধ্য থেকে নীল রঙটি দোহন করে নেবার চেষ্টা ছবির কল্পনার মধ্যেও মাধ্যাকর্ষণ অনিবার্যতাহীন ভাবালুতার (ভাবুকতা নয়) রূপে প্রকাশ পেয়েছে—

কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা, টিপটি নীলা কাঁচপোকার,
ধূপের ধোঁয়া পাথ্‌না তোমার, মূল কি তুমি সব ধোঁকার!
নীল গাভী নীল মেঘ দুহে নাও তার বিজুলী শিং ধরি
নীলপরী গো নীলপরী!

'বিদ্যুৎ পর্ণা' কবিতাটিও পরীর হাল্কা রাজ্যের সুর ও ছন্দে পূর্ণ। অনন্তসুখ ও বিলাসের লীলাভূমি স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে দুঃখমিশ্রিত পৃথিবীর মাটির টানে সেদিক পানে চলে আসবার কামনাই এই কবিতাটির ভারকেন্দ্র। কিন্তু সুগভীর সত্যপ্রীতি এ কবিতার ভাবে থাকলেও ভাষায় নেই, ছন্দে নেই। কোন গভীর জীবনোপলব্ধিই এখানে প্রকাশ পায় নি। কবিতাটির মূল আবেদন কানের কাছে। এ কবিতায় চিত্র আছে, কিন্তু চিত্রগুলিও চোখকে স্পর্শমাত্র করে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দিকে যেন দ্রুত ছুটে চলে। পরীর লঘুচঞ্চল নৃত্যের (রবীন্দ্রনাথ কথিত উর্বশীর নৃত্য এ নয়,

যার মদির তালে গ্রহনক্ষত্র থেকে নিখিল পুরুষচিত্তে কামনা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে) ছন্দটি এর শব্দচয়ন ও চিত্ররচনাকে আশ্রয় করেছে। নূপুরের দ্রুতলয়ের ঝঙ্কারকে ব্যর্থ হতে দেন নি কবি, বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্বে পাছে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এই জন্য বক্তব্যটিকে পর্যন্ত গৌণ করে রেখেছেন। কবির কল্পনার বিদ্যুৎপর্ণা তাই জীবনমন্থনজাত গুরুতর জিজ্ঞাসাকে জাগায় না, স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে আসার কথা বার বার বললেও সে যে 'অতি চঞ্চল মতি' শুধুমাত্র গতি মূর্তিমতী,—

অশ্রুর মৌক্তিক! হাস্যের স্ফূর্তি!
লহরের লীলা ঠিক লাস্যের মূর্তি

তাতে সন্দেহ থাকে না। সে এই কথাগুলিতে নিজের সত্য পরিচয়ই দিয়েছে—

আমি পরী অপ্সরী
বিদ্যুৎপর্ণা—
মন্দার কেশে পরি
পারিজাত-কর্ণা;
নেমে এনু ধরণীতে
ধূলিময় সরণীতে
ক্ষণিকের ফুল নিতে
কাঞ্চন-বর্ণা।

॥ তিন ॥

পরিণত বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ প্রেমের কবিতা লেখেন নি। 'বেণু ও বীণা'য় রবীন্দ্রভাবনার বহিরঙ্গ অনুসরণকারী কিছু প্রেমকবিতা আছে, 'কুহু ও কেকা'য় তাদের সংখ্যা নিশ্চিত কমে গিয়েছে।

আসলে খণ্ড কবিতায়- প্রেমানুভূতি ব্যক্ত করতে যে কল্পনাপ্রবণ, মনের অধিকার থাকা প্রয়োজন সত্যেন্দ্রনাথের তা ছিল না। তিনি অন্তর-অনুপ্রেরণার স্পর্শহীন কতকগুলি ব্যর্থ প্রেমকবিতা লিখবার চেষ্টা না করে কবি হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত হন নি।

প্রেমভাবনা তথা সৌন্দর্যকল্পনা সত্যেন্দ্রনাথের কবিচিত্তের সামগ্রিক সমর্থন লাভ করে কি রূপ লাভ করতে পারে তার নিদর্শন মিলবে গুজরাটি গরবার সুরে লেখা অনেকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি কবিতায় এবং 'কিশোরী'তে। এ কবিতাগুলিতে সত্যেন্দ্রনাথ অণুকরণে ব্যস্ত হন নি; নিজ অন্তর-ধর্মের সঙ্গে এই বিষয় ও রসের স্বাভাবিক সম্পর্ক না থাকায় কবি শুধুমাত্র ফ্যাসানের বশবর্তী হয়ে কতকগুলি প্রসাধন-প্রধান ব্যর্থ কবিতা লেখেন নি, তাঁর মনোধর্ম এই বিষয় ও রসকে পরিবর্তিত করে যে নবীনতা দান করতে পারে তারই অনুগত থেকেছেন কবি।

'কিশোরী' কবিতায় প্রেম ও নিখিল সৌন্দর্যচেতনার একটি বাণী প্রকাশিত। কবির কল্পনায় এই নারী বিশ্ব-সৌন্দর্যের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিতা। রূপজগৎ তারই স্পর্শে প্রাণবন্ত; সে-ই নিখিলের কামনার ধন। তার পদপাতে বিশৃঙ্খলা কল্যাণের জ্যোতিঃসম্পাতে মহিমময় হয়ে ওঠে। কবিতাটির ছন্দ, শব্দ, চিত্র, সুর, বর্ণবিলাস সব কিছু থেকে বক্তব্যটি ছেঁকে নিলে (যদি আদৌ সে ভাবে বক্তব্য ছেঁকে নেওয়া সম্ভব হয়) এই-ই দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরী কবিতার সঙ্গে এর ভাবগত ঐক্য ধরা পড়ে (সত্যেন্দ্রনাথের কখনই রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনার গভীরতায় অধিকার জন্মাতে পারে না—এ কথা মনে রেখে বলা হচ্ছে।), কিন্তু ভাষারূপে যে মূর্তি কবিতা দুটি লাভ করেছে তার মধ্যে আমূল পার্থক্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁর ধ্যানের মানসী ব্যক্তি-মূর্তি থেকে

ভাবানুভূতির সত্যে মুহুর্মুহু রূপান্তরিত হয়েছে, সীমার জগৎ নিখিল প্রাণের আকুতির সঙ্গে হয়েছে সংবদ্ধ। খণ্ড রূপে অখণ্ডের প্রভা জেগেছে ক্ষণে ক্ষণে—

মানসীরূপিণী ওগো, বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি গো মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী। এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্তভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; ঊষার গলিতস্বর্ণে
গড়িছ মেখলা, পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি ; বসন্ত বাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ ;

সব মিলে সুগভীর কল্পনা, মর্মভেদী জীবনজিজ্ঞাসা, রূপকে অরূপরসে পরিণত করবার সাধনা সিদ্ধিলাভ করেছে এ কবিতায়। ব্যক্তি-প্রেমকে চিরকালীন সৌন্দর্য-বিরহের আর্তির সঙ্গে যুক্ত করবার বাসনা আত্মপ্রকাশ করেছে। অপরপক্ষে 'কিশোরী' কবিতায় আমরা ভাব-গভীরতার কিছুমাত্র স্পর্শ অনুভব করি না। সর্বত্র খেয়ালী কল্পনার লঘু লীলাবিলাস হাল্কা হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে—

তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল,

তার আলতা-পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল।
করম্‌চা-ডাল আঁচল ধরে,
ভোমরা তারে পাগল করে,
মাছ্‌-রাঙা চায় শিকার ভুলে,
কুহরে পিক অনর্গল ;
তার গঙ্গাজলী ডুরের ডোরা
বুকে আঁকে দীঘির জল।

ঘাটের পথে তাকে আসতে দেখে শিউলি ঝরে পড়ে পথের উপর, আর 'জুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে প্রজাপতি কাঁপতে থাকে।' কিন্তু কিছুতেই 'নিবিড়' সৌন্দর্যানুভূতির ভাবটি ব্যক্ত হয় না প্রজাপতির হাল্কা ডানার কম্পনে। উপকরণগুলি প্রায়ই গ্রামবাংলার পরিবেশ থেকে সঙ্কলিত। নিখিল সৌন্দর্যের কেন্দ্রসত্য নারী-রূপকে প্রকাশ করার সুযোগ তার কতটুকু? সামান্যের পাত্রে শিশিরের আস্বাদ মেলে, অমৃতের তৃষ্ণা ধরা যায় না। আসলে কবির কল্পনা যে রূপকথার প্রান্তশায়ী অল্প ব্যবধানেই তা সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে—

ওই সওদাগরের বোঝাই ডিঙা
ফিঙার মত চলত উড়ে,
তার পরশ-লোভে আজকে সে হায়,
দাঁড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে।
অরাজকের পাগলা হাতী
পথে পথে ফিরছে মাতি,—
তারে দেখ্‌তে পেলেই করবে রাণী
শুঁড়ে তুলে তুলবে মুড়ে!

'দূরের পাল্লা' কবিতার মাঝিদের স্বপ্নলোকবাসিনী সুন্দরীও গ্রাম্য বালিকার রূপকে ভিত্তি করে একান্ত লঘুকল্পনাবিলাসিতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে।—

ওর তরে মন্থরে নদ হেথা চল্‌ছে,
জলপিপি ওর মৃদু বোল্ বুঝি বোল্‌ছে।
আটকেছে যেই ডিঙা চাইছে সে পর্শ,
সঙ্কটে শক্তি ও সংসারে হর্ষ।
পান বিনে ঠোঁট রাঙা চোখ কালো ভোম্‌রা,
রূপশালি-ধান-ভানা রূপ দ্যাখো তোমরা।

গুজরাটি গরবার সুরে গেয় ত্রিশটি গান 'বেলা শেষের গান' কাব্যে সঙ্কলিত হয়েছে। অভিপ্রেত সুরে গীত হলে এদের আস্বাদ কিরূপ দাঁড়াবে সে ভাবনা-নিরক্ষেপ ভাবেই বলা চলে কবিতা হিসেবেও এগুলি উপাদেয়। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'গজল' নামক সনেটে লঘুসুরের প্রেম কবিতার প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে—

নয়ন গোলাপ তব করিতে উজ্জ্বল
বুলবুলের সুরে আজ বেঁধেছি সেতার
গাহিব প্রেমের গান পারসী কেতার
ফুলের মতন লঘু রঙিলা গজল।
যে-সুর পশিয়া কানে চোখে আনে জল
সে-সুর বিবাদী জেনো মোর কবিতার
মম গীতে নত তব চোখের পাতার
সীমান্তে রচিয়া দিব দুছত্র কাজল।

বাজায়ে দেখেছি ঢের বীণ ও রবাব
পাইনি সে-স্বরে তব প্রাণের জবাব।
আজ তাই রেখে সব ধ্রুপদ ধামার
চুটকিতে রাখি সব আশা-ভালোবাসা
দরদ ঈষৎ আছে এ গীতে আমার
স্বরে ভাবে মিল আছে দুই ভাসাভাসা।

প্রমথ চৌধুরীর এ কবিতার লঘুরঙের পেছন থেকে বিদগ্ধমনের উঁকিঝুঁকি আছে, কথায় ছুরির ধার এখানে না থাকলেও, একই কামারশালায় যে এই ভাষায় শান পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সত্যেন্দ্রনাথের প্রেমকবিতাবিষয়ক মনোভাবও বোধ হয় এই—'চুটকিতে রাখি সব আশা-ভালোবাসা', তাঁরও সম্ভবত লক্ষ্য স্বরে ভাবে ভাসাভাসা মিল এবং কিঞ্চিৎ দরদের স্পর্শ। তবে বীরবলসুলভ বৈদগ্ধ্যশানিত মনোভাব তাঁর নয়, তারুণ্যোচ্ছল প্রাণের স্ফূর্তিই এই কবিতাগুলির পেছনের হৃদয়-উৎস।

গুজরাটি গরবার সুরে বেলোয়ারীর মনোহারী ঠুং ঠাং বাজিয়ে তুলতে চেয়েছেন কবি—

শোন্ সখী। গায় কারা আজ রাতে গুজরাতী গর্‌বা।
খঞ্জন-নর্তন-হিল্লোল-গর্তা।
প্রিয়া গন্ধর্বের হিয়া কন্দর্পের
হার মানে ঠুংরী কাহার্‌বা।
দুনিয়ার আদরের ফুর্‌তির আতরের—
মনোহারী বেলোয়ারী কার্‌বা।

কবি প্রেমের সঙ্গী প্রকৃতিকে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু সেও লঘুসুরই বাজিয়েছে, চটুল নৃত্যেই তারও আনন্দ।

খিল্-খোলা ফর্দাতে যাব চল্, সাধ জেগেছে !
রইব কে ঘরে আজ চাঁদ ডেকেছে !
আলো হোথা চুপিচুপি নিয়ে পাউডার থুপি
ফুল দিয়ে ফুল ঢেকেছে।
দিল্ দরিয়ার জলে উথ্লিয়ে ঢেউ চলে
নিস্মৃতির বাঁধ ভেঙ্গেছে !

এ রাজ্যে চাঁদ 'আলুথালু···ঢুলুঢুলু মৌজে', জ্যোৎস্না হয়েছে 'জোছনা', তারারা কাতারে কাতারে জুটে শব্দের ঝরোকায় উঁকি দেয়, 'মহুয়া ফুলের হাইয়ে হাওয়া ভুর্ ভুর্', ফুলেরা কার খুন্সুড়ি সইবার জন্য জেগে থাকে, ঝিঁঝিঁদের রিম্‌ঝিম্ ঝঙ্কারে গান জাগে, বিহ্বল হাওয়া 'কিরণের থির জলে' যেন 'বাদশাহী হৌজে' অবগাহন করে, আর জোছনায় মোহগ্রস্ত জোনাকী মূর্ছিত হয়ে পড়ে 'পারুলী পিয়ালাফুলি কৌচে।' লঘু দ্রুতলয়ের ছন্দে ও ভারহীন শব্দের ঝোঁকপ্রধান উচ্চারণের আয়ুধ হস্তে সত্যেন্দ্রনাথ কাব্য-কল্পনার এ-রাজ্যের প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি।

॥ চার ॥

লঘুতরল খেয়ালী কল্পনার মাধ্যাকর্ষণচ্যুত বহুবর্ণরঞ্জিত অপরূপ দায়িত্বহীনতা শিশুপ্রিয় ছড়া ও রূপকথার নিকট প্রতিবেশী। কখনও কখনও শিশুমনেব নিকটে সহজেই কবি পৌঁছেছেন। 'তাতারসির গান', 'ইলশে গুঁড়ি' প্রভৃতি কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে। তাতারসির গানে অবশ্য কবি বাঙালির গৌরব-কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে দু-একবার বেসামাল হয়ে পড়েছেন, কিন্তু ইলশে গুঁড়িতে কবি সানন্দে শিশুদের মনের সঙ্গী

থেকেছেন, কোন আকর্ষণই তাঁকে টাটকাভাজা চাল, তালবড়ার লোভ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে নি।

(কবি বক্তব্যহীন রূপসৃষ্টির পরীক্ষা করতে চেয়েছেন কতকগুলি কবিতায়। কল্পনার এই বিশিষ্টতাকে সেই পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়েছে। পরীবিষয়ক কবিতাগুলিতে দেখেছি কবি কোথাও স্পর্শেন্দ্রিয়, কোথাও শ্রবণেন্দ্রিয়, কোথাও বা দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে আবেদনকে একাগ্র করে তুলতে চাইছেন। শ্রবণেন্দ্রিযের কাছে শব্দের সজ্জা কখনও লঘু সুরের হিল্লোল তুলেছে, কখনও দ্রুত লয়ের তালকেই প্রাধান্য দিয়েছে। চোখের কাছেও কোথাও রেখাচিত্রের শোভাযাত্রা, কোথাও বিচিত্র রঙের খেলা, কখনও আবার বিশেষ করে জ্যোতিবিকীর্ণ উজ্জ্বলতা।

'পিয়ানোর গান' কবিতাটিতে শব্দের অর্থ-অংশকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বনি (sound) অংশের কাছে আত্মসমর্পণ করানো হয়েছে।) বক্তব্যের এরূপ সার্বিক অবলুপ্তি নিঃসন্দেহে এক অভিনব পরীক্ষা—

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
তার তুল্ কার মুখ?
তার তুল্ কোন্ ফুল?
বিল্ কুল্ তুল্ তুল্
টুক্ টুক্ বিল্ কুল্
এল্-বসরাই গুল্!
দেল্-রোশনাই-ফুল।

('বিদ্যুৎবিলাসে'ও একই চেষ্টা। এ কবিতায় চিত্ররচনা আছে, কিন্তু তা অবলম্বন মাত্র, ছন্দের কাছে ছবি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত। কোনো বিশেষ ভাবরস ফোটানো নয়, ছন্দনৃত্যে সব ভুলে যাওয়াই কবির

অভিপ্রেত। 'ছন্দ-হিন্দোল'-এর স্বরূপ কবিতার নামেই প্রকাশিত। কবি হর্ষোৎফুল্ল—এই ভাববিন্দুটি মাত্র ছন্দের চপল নৃত্যের মধ্য থেকে অনুভব করেছেন। নৃত্যটাই আসল, নট থেকে বিচ্ছিন্ন অমূর্ত নৃত্যের চাপল্যটুকু নিয়েই কবি মগ্ন—

মেঘ্‌লা থম্‌থম্‌ সূর্য্য-ইন্দু
ডুব্‌ল বাদ্‌লায়, দুল্‌ল সিন্ধু!
হেম্‌-কদম্বে তৃণ-স্তম্ভে
ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রুবিন্দু!...
সান্দ্রবর্ষণ হর্ষ কল্লোল।
ঝিল্লী-গুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল।
মূর্চ্ছে বীণ আর মূর্চ্ছে বীণ্‌কার—
মূর্চ্ছে বর্ষার ছন্দ-হিন্দোল!

('ঝর্ণা' কবিতায় আবার শব্দসাধনা চিত্রধর্মের সঙ্গে সমন্বিত হতে চেয়েছে। আর 'জৈষ্ঠী-মধু' কবিতায়ও এই সমন্বয়-চেষ্টা লঘু মেজাজী আস্বাদটুকু সাফল্যের সঙ্গে ধরে রেখেছে—)

কত বোল্‌তা সোনেলা রোদ পিয়ে
বুঁদ হয়ে ফেরে রোঁদ দিয়ে;
ফলসা-বনের জল্‌সা ফুরুলো,
মৌমাছি এল রোল তুলে।

(কবি-কল্পনার এই বিশেষ প্রবণতা সার্থকতর কবিতার জন্ম দিয়েছে 'পাল্কীর গান'-এ। 'দূরের পাল্লা'ও অনেকটা এক ধরনের পরিকল্পনাজাত, কিন্তু বস্তুচিত্র আর রূপকথাসুলভ তরল কল্পনার সুখী মিলন এখানে ঘটে নি। এই দুটি কবিতায়ই দায়িত্বহীন ভ্রমণ-শীলতা আছে। এখানে চিত্র রচনায় কবির বন্ধন নেই, বিষয়ের,

কেন্দ্রে নিবিষ্ট থাকার নেই কোন বিশেষ তাগিদ। কবি এমন ভাবে বিষয় চয়ন করেছেন যাতে বিষয়কে অস্বীকার না করেও নানা অসংলগ্ন চিত্রকে সর্বস্ব করে তোলা, তাদের মধ্যে যোগাযোগ আবিষ্কার করা চলে। দ্রুত তালে ধাবমান ছয় বেহারার পাল্কী যাত্রাপথে নানা টুকরো ছবির সংস্পর্শে আসতে পারে। বিচিত্রকে এক পাত্রে লাভ করার সহজতর পন্থা আর নেই। তিন দাঁড়-নৌকাও নদীপথে গমন কালে নানা খণ্ড বস্তুর রূপকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবেই; তাদের মধ্যে কোন পারম্পর্য, কার্য-কারণগত কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আবেদনগত তীব্র একাগ্রতা অপেক্ষিত নয়। বিচিত্র চিত্ররসে মগ্ন হয়ে থাকার এই কেন্দ্রচ্যুত দায়িত্ববন্ধনহীন মানসিকতা লঘু খেয়ালী কল্পনার তরল বিলাসিতার মনোরাজ্যেই জন্ম নিয়েছে। বহু কবিতায় যেমন বস্তুকে অস্বীকার করে চোখের ভোজের আয়োজন করেছেন কবি রঙে ও রেখায় এখানে তার প্রয়োজন হয় নি। বস্তুকে স্বীকার করেও সে আয়োজনে বাধা ঘটে নি।)

('পাল্কীর গান' শব্দধৃত চিত্রপ্রদর্শনী। কবি নিজ বিশিষ্ট প্রবণতা গুণেই চিত্রগুলি থেকে দূরে থেকেছেন।) পাল্কীর ছয় বেহারার দৃষ্টিকোণকেই সত্য বলে মেনেছেন, আপন মনের রঙ ধরান নি কোথাও।) তদুপরি চলচ্চিত্রের টেকনিককে যেন আত্মসাৎ করে কবিতার শব্দচিত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। পরের পর ছবি ভেসে আসছে, ছুটে পালাচ্ছে পিছন দিকে। বেহারাদের চলার গতিই স্থির বস্তুতে সঞ্চারিত হয়েছে। এই ছবিগুলি বিচ্ছিন্ন হলেও সব মিলে গ্রামবাংলার জীবনযাত্রার একটা ব্যাপক বোধ যেন পাঠক-মনে ধরিয়ে দেয়। অথচ খণ্ড খণ্ড এই ছবিগুলির মধ্যে কিছুই পারম্পর্য নেই। (এই রীতিকে চলচ্চিত্রশিল্পে মন্তাজ বলা হয়ে

থাকে। কবির সবচেয়ে বড় কবিত্ব এখানে—পল্লীজীবনের চিত্রে এক দিকে বাস্তবতাকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করায়, অন্যদিকে তাদের প্রশান্ত প্রাত্যহিকতাকে দ্রষ্টা বেহারাদের ছুটন্ত চোখ আর মনের গতিতে ভরে দেওয়ায়। তাছাড়া বেহারাদের মনোভাবও চিত্র-গুলির বাস্তবতাকে কিছুমাত্র আহত না করেই নানা মুডের ও মেজাজের রঙ্ লাগিয়েছে তাদের চারপাশে। কবি সেই ভাবানুভূতিকে সরাসরি প্রকাশ না করে চিত্রের মাধ্যমকে গ্রহণ করেছেন। চলচ্চিত্রে ভাব প্রকাশের পদ্ধতি হ'ল audio visual'; —বলা যেতে পারে দৃশ্যমূল; শ্রুতি তার সাহচর্য করে এই মাত্র। এখানেও তাই। দুপুরের তপ্ত মাঠে চলার কঠিন পরিশ্রম ধরা পড়েছে এই চিত্রে—

গ্রাম ছাড়িয়ে আগ্ বাড়িয়ে
নামল মাঠে তামার টাটে।
তপ্ত তামা—যায় না থামা,—
উঠছে আলে নামছে গাড়ায়,—
পাল্কী দোলে ঢেউয়ের নাড়ায়।...
... .
আবার মাঠে,—তামার টাটে,—
কেউ ছোটে, কেউ কষ্টে হাঁটে,
মাঠের মাটি রৌদ্রে ফাটি,
পাল্কী মাতে আপন নাটে।

তপ্ত মাঠে ছুটন্ত বেহারাদের চোখের শান্তির কামনা এই ছবিকে কোমলতা দিয়েছে—

কাজলা সবুজ কাজল প'রে
পাটের জমি ঝিমায় দূরে!

নির্জন দুপুরের ভাবাবেশ মূর্ত হয়েছে এখানে—

তাকাই দূরে শূন্যে ঘুরে
চিল ফুকারে মাঠের পারে।...
শঙ্খ চিলের সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে মেঘ চলেছে।

অথবা দীর্ঘ শ্রমের ক্লান্তি যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে এই চিত্রে—

পাল্কী চলেরে, অঙ্গ টলেরে,
সূর্য ঢলে, পাল্কী চলে।

'দূরের পাল্লা' কবিতায় তিন দাঁড় ছিপের দ্রুত ছোটা, জল কাটিয়ে চলতে চলতে দুপাশের ছবি দেখা, খণ্ড খণ্ড চিত্ররসে বাস্তবের অনুসরণ ভাষারূপ পেয়েছে। কিন্তু চিত্রভিত্তিতে পূর্বোক্ত কবিতার মত বস্তুসত্য স্থান পায় নি। এ কবিতাটিতে প্রথমে লঘু কল্পনাবিলাস, ভাববস্তু থেকে বর্ণবিলাস ও শব্দ (sound) জাত শ্রুতিসুখকরতা কবিকে অধিক মুগ্ধ করেছে। বর্ণ অপেক্ষা শব্দের দিকেই অবশ্য ঝোঁক বেশী। যেমন—

চুপ চুপ ওই ডুব দ্যায় পান্‌কৌটি
দ্যায় ডুব টুপ টুপ ঘোমটার বউটি।
ঝক্ ঝক্ কলসীর বক্ বক্ শোন্ গো।
ঘোম্‌টায় ফাঁক বয় মন উন্মন্ গো।

এ কবিতায় প্রেমকে কেন্দ্র করে লঘু খেয়ালী কল্পনার খেলা কেমন ফেনিয়ে উঠেছে তার পরিচয় অন্যত্র নিয়েছি। ভীতিরস সৃষ্টিতেও রূপকথাসুলভ ভাবনার নৈকট্য প্রকাশ পেয়েছে—

হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থমকে গেল।

প্রকৃতিচিত্রণেও এই দৃষ্টি লঘুকাল্পনিকতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। আলেয়াকে ডাক পেয়াদা বলে মনে হয়েছে, শুকতারা পিচ্‌কিরিতে আলো দিচ্ছে যেন, তারা আর জোনাকিরা মিলে গিয়ে ভ্রান্তি জাগাচ্ছে, তারা-ভরা আকাশ আর তার ছায়া-ভরা নদীর জল মিলে গিয়ে সেই ভ্রমকে ঘনীভূত করেছে, যদিও খাঁটি কল্পনা যে জাতীয় ভ্রান্তি আনে তার থেকে এর স্বাতন্ত্র্যও লক্ষণীয়—

কোথায় এল নৌকাখানা!
তারার ঝড়ে হইরে কাণা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকা চলে আকাশ চিরে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিশ্ব-বিচিত্রা

The translator should retain every peculiarity of the original, so far as he is able, with the greater care the more foreign it may be.

—F. W. Newman

I call it the principle of equivalent effect and regard it as signifying that that translation is the best which comes nearest to creating in its audience the same impression as was made by the original on its contemporaries. Higher than this, I hold that no translator can aim.

—E. V. Rieu : Encyclopaedia of Literature.

॥ এক ॥

কবিতার অনুবাদক হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতি একাল পর্যন্ত প্রসারিত*। কিন্তু উত্তম কবিতার পূর্ণ আস্বাদবহনক্ষম অনুবাদ আদৌ সম্ভব কি? এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নি, সম্ভবত হওয়া সম্ভবও নয়। উপন্যাস, মহাকাব্য, অন্যবিধ আখ্যানমূলক কবিতার অনুবাদ বরং সম্ভব! কাহিনী ও চরিত্রের আবেদনকে ভাষান্তরিত

*ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায় 'অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থে অনুবাদ কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্যের পরিমাণ নির্ণয় করেছেন। বিশেষ করে ফরাসী ও ফার্সী ভাষা জানার ফলে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় তথ্যের ও বিশ্লেষণের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থটির কাছে আমি ঋণী। কিন্তু ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার মূল সিদ্ধান্তের পার্থক্য পাঠক সহজেই লক্ষ্য করবেন।

করেও অনেকাংশে ধরে রাখা যায়। অনুবাদের ফাঁক দিয়ে মূল রসের আবেদনে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি পড়ে না। অবশ্য যে কোনো জাতের কাব্য-কবিতায় ছন্দের আধারটিতে আঘাত লাগলে রচনার প্রাণ পর্যন্ত বিচলিত হয়। বিশেষ করে গীতি-কবিতায় ছন্দ ও ভাষারূপের সঙ্গে ভাবের সম্পর্কটি একেবারে অচ্ছেদ্য। চরিত্রচিত্রণ বা কাহিনীগ্রন্থনের আশ্রয় না থাকায় ভাষা ও ভাবের সম্পর্কটির মধ্যে কোনো যবনিকার অন্তরাল থাকে না। শব্দের ব্যঞ্জনা ভাষার নিজস্ব প্রাণশক্তির উপরে নির্ভর করে। প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব শব্দধর্ম আছে। শুধু অর্থ প্রকাশ করেই এই ধর্মের কর্তব্য সমাপ্ত হয় না। অর্থকে সত্য করে, প্রাণস্পর্শী করে, তাৎপর্যমণ্ডিত করে শব্দের ধ্বনি (sound)-বিশিষ্টতা। দেশ-কাল-পাত্র পরিবেশগত পার্থক্য যদি-বা দূর করা সম্ভবও হয়; শব্দের আবেদনের ক্ষেত্রে সন্ধি না করে উপায় নেই। কবিতা ভাষান্তরিত হলে অর্থের বোধ যদি-বা জন্মায়, শব্দের ঐ ব্যঞ্জনাধর্ম, অথবা নেহাৎই স্বর, ব্যঞ্জন, দীর্ঘ, হ্রস্ব প্রভৃতি বিচিত্র ও জটিল ধ্বনিগত আবেদন কোথায় মিলবে? কবিতার প্রতিটি শব্দ ও শব্দের বিন্যাস অপরিবর্তনীয়। যে ভাষায় কবিতা রচিত তা থেকে তুলে এনে অন্য ভাষায় স্থানান্তরিত করলে তার রূপ বদলে যায়, চরিত্রও বদলাতে বাধ্য।

তবুও কবিতার অনুবাদ হচ্ছে এবং হয়েছে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও বেশী করে অনুবাদ হবে। মানুষের পৃথিবী নিকটতর হচ্ছে। ভাষার বাধা লঙ্ঘন করে মানুষ মিলিত হচ্ছে। কবিতার চার-পাশেও ভাষার দেয়াল থাকা সম্ভব নয়। যতটুকু হোক আস্বাদ পাওয়া যাবে অনুবাদের মধ্য থেকে। পূর্ণ আস্বাদ যেখানে অসম্ভব সেখানে আংশিক আস্বাদের অধিকার ছাড়া কেন? এর ফল ভালই

হচ্ছে। মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে বহু ভাষার সাহিত্যসম্পদকে স্পর্শ করার সুযোগ মানুষ পাচ্ছে। উন্নত ভাষায় অনুবাদেরও পরিমাণ প্রচুর, সীমাবদ্ধ সাফল্যও দুর্লভ নয়। অনুবাদকর্মের মূল্যকে ছোট করে দেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেই অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বাংলা গদ্যের ভিত্তিস্থাপনে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অনুবাদকর্ম অপরিসীম সাহায্য করেছে। শুধু তাই-ই নয়, বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠা-পর্বে, চৈতন্যপূর্ব কালে, সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ বাঙালি কবিদের পথ দেখিয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্যাস্বাদের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় অনুবাদ সীমাবদ্ধ সাফল্যই মাত্র অর্জন করতে পারে।

অনুবাদের আদর্শ কি হবে? পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। নিউম্যান যাথার্থ্যকেই অনুবাদের আদর্শ বলে নির্দেশ করেছেন। মূলের ভাব ও ভাষাগত প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যতটা সম্ভব অনুবাদেও রক্ষা করতে হবে। নিশ্ছিদ্র মূলানুগত্যই অনুবাদের লক্ষ্য—এ সিদ্ধান্ত তত্ত্বের দিক থেকে যতই আদর্শ বলে মনে হোক না কেন, বাস্তবত কতটা অনুসরণযোগ্য সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ম্যাথু আর্নল্ড অনুবাদের অন্য লক্ষ্যের কথা বলেছেন। তাঁর মতে অনুবাদকের কর্তব্য হল 'to satisfy scholars'। তিনি 'On translating Homer' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আর্নল্ড অনুবাদকর্মের সার্বজনীন আবেদনকে অস্বীকার করে, ভাষাপণ্ডিতদের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক থেকেই অনুবাদকে দেখতে চান। আর্নল্ডের মত পাঠকচিত্তে যাথার্থ্যের কোন ভ্রান্তি আনতে পারে না। কিন্তু নিউম্যানের বক্তব্যটি পাঠককে প্রথমেই জয় করে নেয়। এই অধ্যায়ের প্রথমেই অনুবাদের সীমাবদ্ধতার যে সব কারণ দেখিয়েছি

নিউম্যানের তত্ত্বটিও সেসব কারণেই অভিপ্রেত সাফল্য লাভ করতে পারে না। যথাযথ অনুবাদে ভাবকে ধরা যেতে পারে, ভাষাকে কতটা আয়ত্ত করা যায়? ভাষাকে আয়ত্ত করতে না পারলে ভাবের ঘরেও কারচুপি থেকে যায়, আর অত্যধিক 'literal' হওয়ায় মূলের রসাস্বাদে বিঘ্ন ঘটা স্বাভাবিক।

ই. ভি. রিউ এ বিষয়ে যে তত্ত্বটি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন আমার কাছে সেটিই সবচেয়ে সার্থক এবং অনুসরণযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি এই তত্ত্বটিকে বলতে চেয়েছেন, 'principle of equivalent effect'—সমকালীন পাঠকগোষ্ঠীর কাছে মূল গ্রন্থ যে রসের আস্বাদ এনেছিল যে অনুবাদ তার পাঠকদের মনে অনুরূপ (যতটা নৈকট্য সম্ভব) আস্বাদ জাগাতে পারে তাকেই সার্থক অনুবাদ বলে গ্রহণ করা উচিত। ইংরেজীতে বাইবেলের নূতন অনুবাদ করার জন্য নিযুক্ত বিশেষ কমিটিও এরূপ কথাই বলেছিলেন, "We aim at a version which shall be intelligible to contemporary readers—or as nearly as possible. It is to be genuinely English in idiom, such as will not awaken a sense of strangeness or remoteness. It should not aim at preserving 'hallowed associations'; it should aim at conveying a sense of reality." এই উদ্দেশ্যে অনুবাদক অন্ধ মূলানুগত্য থেকে কোথাও কোথাও কিছু কিছু বিচ্যুত হতে পারেন, এমন কি এই ধরনের বিচ্যুতি প্রয়োজনীয় বলেও মনে হতে পারে।

কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য দুটি পূর্ব-শর্ত আরোপ করা খুব অসঙ্গত নাও হতে পারে। কবিতার অনুবাদককে অবশ্য কবি হতে হবে। গদ্যরচনার অনুবাদক

অনেকেই হতে পারেন; প্রবন্ধলেখক উপন্যাসের সফল অনুবাদ করতে পারেন; কিন্তু কবিতার সফল অনুবাদক হবেন একমাত্র কবিই। দ্বিতীয়, যাঁর কবিতা অনুবাদ করা হবে তাঁর সৌন্দর্য-দৃষ্টি, জীবনজিজ্ঞাসা ও রূপ-নির্মাণকলার কোনো-কোনো দিকের সঙ্গে অনুবাদক আপন সামীপ্য উপলব্ধি করবেন। এরূপ ঘটলেই অনুবাদক কবিও সৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন, অপরের সৃষ্টির মধ্যেও পূর্ণভাবে জেগে উঠতে পারেন।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতার বিচারে এই মাপকাঠির সাহায্য নেওয়াই বিধেয়। মনে রাখা উচিত, কোনো কবিতা অনুবাদ কিনা তা বিস্মৃত হয়ে বিচার করলে রচনাটিকে ভালো বলে মনে হতে পারে, কিন্তু মূল কবিতা সমকালীন পাঠকচিত্তে যে রসের আবেদন জাগাত সেই আবেদন সৃষ্টিতে সমর্থ না হলে অনুবাদ হিসেবে তার সাফল্য স্বীকার্য নয়।

॥ দুই ॥

সত্যেন্দ্রনাথ 'তীর্থরেণু', 'তীর্থসলিল' এবং 'মণিমঞ্জুষা' এই তিনটি কাব্যে তাঁর অনুবাদ কবিতাগুলি সঙ্কলন করেছেন।

এক। কবি বিদেশি ভাষার মধ্যে ফরাসী, ফার্সী ও ইংরেজী জানতেন। হয়তো কিছুটা জর্মানও। দেশীয় প্রাচীন ভাষার মধ্যে সংস্কৃত তাঁর জানা ছিল। এই সব ভাষা থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রে কবি মূল কবিতাবলীর সঙ্গে পরিচয়ের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু কবির অনুবাদ এই ভাষাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। তিনি চীন, জাপান, আরব, কাফ্রীদেশ অবলীলাক্রমে পরিক্রমা করেছেন, পারস্য-মিশর-তাতার-রুশ-তিব্বত-গ্রীস—প্রাচীন ও বর্তমান—সাহিত্যের সর্বমহলের কিছু সংবাদ কিছু আস্বাদ দেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন।

এদের অনেকগুলিই যে অনুবাদের অনুবাদ তাতে সন্দেহ নেই। কবি নিজেও তা স্বীকার করেছেন।

দুই। কবি যে মনোভাব থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন তাকে বিশুদ্ধভাবে সাহিত্যিক বলা চলে না। 'তীর্থ-সলিলে'র ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন, 'বিশ্বমানবের নানা বেশ, নানা মূর্তি ও নানা ভাবের সহিত পরিচয় সাধনই এই গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য।' বিশ্বমানবের মৈত্রী-মন্ত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। এই মৈত্রীসাধনায় অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এরূপ বিশ্বাসে চিত্ত স্থির রেখে সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদকর্মকে তাঁর কাব্য-সাধনার একটি প্রধান ধারারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তীর্থ-সলিলের মুখবন্ধ-কবিতায় কবি লিখেছেন—

আমার কণ্ঠে গাহিছেন ব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস!
দান্তে, হোমার, শেক্ষপীয়ার, কণ্ঠে করিছে বাস!
গেটে, হুগো, বায়রণ,
হেঙজ্, হাফেজ, স্যাফো, অবৈয়ার, খুস্‌হাল, টেনিসন্।
ওমর খৈয়াম্ আসিয়া মিলেছে, এসেছে ভল্টেয়ার;
হায়েন্ এসেছে, শেলি, সাদি, কীট্‌স, বার্নস, বেরাঞ্জার
আরো যে এসেছে কত!
মোদের পদ্মবনে জগতের জুটেছে মধুব্রত!

যে সাম্য-ভাবনা তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক বিশ্বাসের মূলে তারই বশবর্তী হয়ে কবি কাফ্রী ও শ্বেতাঙ্গদের প্রেম-কবিতাকে পাশাপাশি বসিয়েছেন, রাজতন্ত্রী দেশমাহাত্ম্য-গীতির পাশে গণ-তান্ত্রিক জাতীয় সঙ্গীতকে বসিয়েছেন। সাহিত্যের রাজ্যই প্রকৃত সাম্যের রাজ্য, মনুষ্যত্বের সর্ব বাধা ও সংস্কারমুক্ত মিলনের রাজ্য। এই কারণেই সত্যেন্দ্রনাথ স্বল্পসংখ্যক, বিশেষ মেজাজের, বিশিষ্ট

দেশ ও কালের কবির কবিতা অনুবাদের প্রবণতা দেখান নি, নিজের কবিদৃষ্টির সঙ্গে কিছুমাত্র সাধর্ম্য নেই এমন কবিদের রচনার অনুবাদে তাঁর কর্পণ্য নেই। সম্ভবত আপন চিত্তের ভারকেন্দ্রে কবির স্বল্পস্থায়ী স্থিতি এবং অকাব্যিক নানাবিধ বাহ্য আকর্ষণ তাঁকে নিজের বিশিষ্টতাকে যেমন চিনতে দেয় নি, তেমনি অনুবাদের ক্ষেত্রেও নির্বাচনের সুযোগ দেয় নি। কবি বহুবিচিত্র রসের কবিতা পড়েছেন, নানা যুগের নানা ব্যক্তিত্বের ও মনোভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। অধ্যয়নশীল রসিক পাঠকের দৃষ্টি তাঁর। হোমর, হোরেস, লিপো, শেলীতে তাঁর সমান আকর্ষণ। মাউরি-হাবসীদের লোকসঙ্গীত, হাফিজ-ওমরের রুবাইয়েৎ আর হুইটম্যান, সুইনবার্ণে তিনি সমানভাবে ডুবে যেতে পারেন। যে মন আত্মসাৎ করতে চায়, আয়ত্তযোগ্য বাহিরকে সঠিকভাবে নির্বাচন করে স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়—সে মন এ নয়। সাহিত্যিক তাগিদ থেকে অনুবাদের কাজে এগোন নি কবি। বেছে বেছে যদি তিনি এমন সব কবিতার অনুবাদ করতেন যেখানে খেয়ালী কল্পনা কিংবা কঠিন যৌবনশক্তির সংহতি প্রকাশ পেয়েছে তবে হয়তো প্রকৃত সাফল্যলাভ ঘটত। এমন কি হাস্যরসাত্মক কবিতার অনুবাদেও তাঁর সার্থকতা লাভের সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তা ঘটে নি।

তিন। সত্যেন্দ্রনাথের ছিল বহু অধ্যয়ন, কিশোরের উৎসাহে সেই অধ্যয়নের প্রমাণ দেবার ঔৎসুক্য কবির মৌলিক কবিতাগুলিতেও নানা সুযোগে আত্মপ্রকাশ করেছে। বহু বিচিত্র দেশ ও কালের বহুসংখ্যক কবির রচনার অনুবাদ করার মধ্যে আপনার বহুপঠনের পরিচয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কবির ছিল না এরূপ মনে করা চলে না। এই মনোভাব কাব্যসৃষ্টিতে সাফল্য আনতে পারে না একথা নিশ্চিত।

চার। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতার সাফল্য অমিশ্র নয়; অমর অনুবাদক তাঁকে কোন দিক থেকেই বলা চলে না। বহু ভাষার ও বিচিত্র মেজাজের কবির সঙ্গে পরিচয় এবং সংখ্যার বহুলতা তাঁর অনুবাদ সম্পর্কে একটা সুখ্যাতি পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে বহুকাল থেকে। এমন কি রবীন্দ্রনাথও তাঁকে লিখেছিলেন, "অনুবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। কবিতাগুলি এমন সহজ ও সরস হইয়াছে যে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। মূলের রস কোনোমতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না। কিন্তু তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রসসৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য।" অনুবাদে সাফল্যের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ মন্তব্য করেছেন, কিন্তু কাব্যানুবাদের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি উদ্ধৃতাংশের শেষ পংক্তিতে যে কথা বলেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়, কেন নয় তা পূর্বেই বলেছি। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা আশীর্বাদ, বিচার নয়।

॥ তিন ॥

অনুবাদক কবি হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্য প্রধানত তাঁর ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসী ও ফার্সী কবিতার ভাষান্তরের সার্থকতার উপরেই নির্ভর করে আছে। হিন্দী ভাষা থেকেও তিনি প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুবাদ করেছেন, কিন্তু সংখ্যায় বা কাব্যোৎকর্ষের বিচারে তারা উল্লেখ্য নয়। অন্যত্র সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদের অনুবাদ করে-ছেন। মূলত ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে একবার হাতবদল হয়ে সে সব অনুবাদ তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে। ইংরেজি

অনুবাদ-সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত হলেও, দুবার অনুবাদের ফলে মূলের ভাষাগত বিশিষ্টতার আস্বাদ গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কাজেই যেসব ক্ষেত্রে মূল ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে সেখানেই তাঁর অনুবাদকর্মের সাফল্য বিচার কর্তব্য।

ইংরেজি কবিতার অনুবাদে তাঁর সাফল্য আদৌ অমিশ্র নয়। নিদারুণ ব্যর্থতাও বহু ক্ষেত্রে তাঁকে বহন করতে হয়েছে। সেক্‌স্‌পীয়র, ব্লেক, সুইনবার্ণ, শেলি, কীট্‌স, বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিং, টেনিসন, বার্নস, মূর প্রভৃতি অনেকের কবিতার অনুবাদই তিনি করেছেন। কোনো কবির কত সংখ্যক কবিতা অনুবাদ করেছেন তা থেকে কবির মনের নাগাল মিলবে না, বিচিত্রের প্রতি আকর্ষণেরই মাত্র পরিচয় পাওয়া যাবে। কয়েকটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ ও মূল পাশাপাশি রেখে কবির অনুবাদ-কর্মের বিচার করা যেতে পারে।

কীট্‌সের কবিতা 'La Belle Dame Sans Mersi'-এর অনুবাদ করেছেন কবি 'নিষ্ঠুরা সুন্দরী' নামে। অনুবাদ পরিপূর্ণ-ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কীট্‌স লিখেছেন—

I see a lily on thy brow
With anguish moist andfever dew ;
And on thy cheek a fading rose
Fast withereth too.

সত্যেন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন—

কমলের মত ধবল-ললাটে
কেন বা ছুটিছে কাল-ঘাম
কপোল-গোলাপ উঠিছে শুকায়ে
নাহি বিরাম।

মূলের রস অনুবাদে কিছুমাত্র রক্ষিত হয় নি। মূল কবিতায় উপমার ভাবটি অনুচ্চারিত থেকে যে সৌন্দর্যভ্রান্তি এনেছে (a lily on thy brow) অনুবাদে তা বিনষ্ট হয়েছে। অপর একটি স্তবকের অনুবাদে আছে—

দেখিনু তাদের ক্ষুধিত অধর,
লেখা যেন তাহে 'সাবধান'
জেগে দেখি আমি হেথায় পড়িয়া,
গিরি শয়ান।

বিস্ময়কর, এর মূল ইংরেজী হল—

I saw their starv'd lips in the gloom
With horrid warning gaped wide,
And I awoke and found me here
On the cold hill side.

'Starv'd lips'-এর ভাবব্যঞ্জনা 'ক্ষুধিত অধরে' মিলতে পারে, কিন্তু 'horrid warning gaped wide'-এর ভয়ঙ্করতা শুধুমাত্র 'সাবধান' লেখায় কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নি। আর 'cold hill side'-এর প্রাণহীন শৈত্যে যে ভীতিজড়িত হতাশ বেদনা ধরে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র 'গিরি শয়ান' তার কাছে পৌছায় নি। দুটি মাত্র স্তবকের ব্যাপারেই নয়, এ কবিতাটির অনুরূপ ব্যর্থতা প্রায় সর্বাংশে। কীট্সের কবিতাটিতে স্বপ্নবিভ্রম, কামনার তীব্রতা, জালবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সৈনিকচিত্তের বাসনাদগ্ধ উদাসীন নির্জন ভ্রমণ যে সৌন্দর্যাবেদন সৃষ্টি করেছে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ পাঠককে সে রাজ্যের সন্ধান দেয় না।

কীট্সের 'Stanzas (In a drear-nighted December)'-এর অনুবাদ করেছেন কবি 'দুখ শর্বরী মাঘে' নাম দিয়ে। 'In a drear-nighted December'-তে যে শীততীব্রতা তা 'দুখ শর্বরী মাঘেতে'

তেমন ধরা পড়ে নি। আর বৃক্ষরাজির যে আনন্দ শিহরণ 'To happy, happy tree'-তে প্রকাশ পেয়েছে (happy শব্দটির পুনরুক্তি নিশ্চয়ই অকারণ নয়) তা আদৌ 'বড় সুখী তরুলতা'র মধ্যে নেই। এবং নিষ্করুণ ব্যর্থতা ধরা পড়েছে শেষ স্তবকের অনুবাদে। কীট্‌সের মূল—

Ah ! would't were so with many
A gentle girl and boy !
But were there ever any
Writhed not at passed joy ?
To know the change and feel it,
When there is none to heal it,
Nor numbed sense to steel it,
Was never said in rhyme.

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ—

আহা যদি সকলেরি
হ'ত গো এমনি হায় ;
অতীতের সুখ স্মরি'
কে না কাঁদে যাতনায় ?
মরমে মরমে পরিবর্তন মানা ;
প্রতীকার নাই,—চিকিৎসা নাই—জানা,
অথচ নহেক অপটু, বধির, কাণা,
সে কথা লেখেনি কবিতায়।

মূল কবিতায় সহজ প্রকৃতি-সৌন্দর্যরস পানের আনন্দ থেকে বঞ্চিত মানুষের নিত্য বেদনাদীর্ণ স্মৃতি-রোমন্থন কবিকণ্ঠে যে তীব্র যন্ত্রণার বাণী দিয়েছে সত্যেন্দ্রনাথে তা একান্তভাবে অনুপস্থিত।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'The Reverie of poor Susan'-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'দিবাস্বপ্ন' নাম দিয়ে। দ্বিপ্রহরে নগরের বুকে

গ্রামের মেয়ে সুসান স্বপ্ন দেখেছে গ্রামের সবুজ মাঠের, ছোট পাহাড়ের, ক্ষুদ্র উত্তপ্ত হৃদয় দিয়ে ঘেরা গৃহাশ্রয়ের; যেন নদীর জলধারা নাগর বস্তীর কদর্যতাকে স্তব্ধ করে দিয়ে সত্য হয়ে উঠেছে। এ দিবাস্বপ্ন মুহূর্তের, স্মৃতিঘেরা ক্ষণিক আনন্দের স্পর্শটুকু রেখে এ বিলীন হয়ে যায়। পিঞ্জরাবদ্ধ Thrush পাখির গানে এমনি করে স্মৃতি জীবন্ত হয়ে ওঠে, কামনা যেন রূপ ধরে, মুছে যায় বাস্তবের ছবি। এই রোমান্টিক ভাবব্যাকুলতা সত্যেন্দ্রনাথের মেজাজে নেই, কবিতায়ও প্রতিফলিত হয় নি। আক্ষরিক অনুবাদ দিয়ে সে ফাঁক ঢাকবেন তিনি কি করে?

All the cover of Wood Street, when
daylight appears,
Hangs a thrush that sings loud, it has
sung for three years:
Poor Susan has passed by the spot, and heard
In the silence of morning the song of the bird
It is a note of enchantment. What ails her?
She sees
A mountain ascending, a vision of trees...

এর নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদ অর্থবহ কিন্তু অনুভূতি বহনে একেবারেই সামর্থ্যহীন—

সরু গলির মোড়ে, তখন দিনের আলোক ঝরে,
ময়না দাঁড়ে গাহে, এমন গাইছে বছর ধরে;
সুসান যেতে পথে, হঠাৎ শুনতে পেলে গান,
শব্দ সাড়া নাইকো ভোরে শুধুই পাখীর তান।
মন ডুবিল গানে, এ কি, কি হল ওর আজ,—
দেখছে যেন জাগে পাহাড় গাছের পরে গাছ।

অনুবাদে Wood Street-এর অনুল্লেখ, Thrush-কে ময়নায়

রূপান্তরিত করা, pail-কে কলসী বলায় দেশীয় ভাবপরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার নিজের ফেলে আসা গ্রামের শান্তির ক্ষুদ্র নীড়টিকে 'a nest like a dove's'-কে 'একটি ছোট ঘর যেন বাবুই পাখীর বাসা'য় পরিবর্তিত করায় দেশীয় পরিবেশ রক্ষিত হলেও মূল কবিতার সুরটিকে একেবারে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। লঘু ছন্দের প্রয়োগও এই অনুবাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেলীর কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রেও ইতস্তত দুএকটি বাক্যে কিংবা চিত্ররচনায় সার্থকতার পরিচয় দিতে পারলেও সাধারণভাবে কবি ব্যর্থই হয়েছেন।—

The wandering airs, they faint
On the dark, the silent stream—
—Lines to an Indian Air

এর অনুবাদে স্বপ্নাতুর ভাবটি সুন্দর রক্ষিত হয়েছে—

নিথর নিবিড় কালো নদীর 'পরে
চলিতে চলিতে বায়ু মূরছি পড়ে—
—মিলন-সঙ্কেত

কিন্তু পরের পংক্তি দুটির অনুবাদে সেই সুর ছিন্ন হয়েছে, বিলীয়মান-চম্পকগন্ধের ভাবব্যঞ্জনা কিছুমাত্র ধরা পড়ে নি। শেলীতে আছে—

The Champak odours fail
Like sweet thoughts in a dream ;

সত্যেন্দ্রনাথে রয়েছে—

মিলায় চাঁপার বাস—নিবিয়া আসে,
ভাবের ভুবন যেন স্বপন-দেশে ;

সৌন্দর্য-স্বপ্নের গাঢ়তা সত্যেন্দ্রনাথের লঘু তরল কল্পনার স্পর্শে রূপকথার রাজ্যের 'স্বপনে' প্রায়ই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

শেলীর 'Vibrates in the memory' কবির 'স্মৃতি' কবিতায় অনূদিত হয়েছে 'অন্তরে কাঁদিয়া ফিরে (Vibrates-এর ভাব-তাৎপর্য 'কাঁদিয়া' শব্দে ধরা যায় কি ?), 'When soft voices die' অনুবাদে দাঁড়িয়েছে 'থেমে গেলে গান'—এরূপ অনুবাদকে সার্থক বলা চলে না। শেলীর 'To a Skylark' কবিতার অনুবাদে ('চাতকের প্রতি') কয়েকটি স্তবকের ভাষাচিত্র সার্থকভাবেই রূপান্তর লাভ করেছে, কিন্তু যেখানে গভীর, সুদূর ও রোমান্টিক ভাবাকুতি তীব্র সুরে নিখিলকে ক্ষণিকের জন্য স্পর্শ করতে চেয়েছে সেখানে অনুবাদের ব্যর্থতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। শেলীর নিম্নোদ্ধৃত স্তবকটি—

We look before and after
And pine for what is not :
Our sincerest laughter
With some pain is fraught
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে দাঁড়িয়েছে—

আগে পাছে চাহি চারিভিতে
কামনা—কোথাও যাহা নাই
আমাদের প্রাণের হাসিতে
মিশে আছে বেদনা সদাই
সবচেয়ে সুমধুর গান—সব চেয়ে দুখের কথাই।

এ অনুবাদে শেলীর একটি মহৎসৃষ্টি সামান্যতায় পর্যবসিত হয়েছে।

স্থইনবার্ণের 'Before sunset' কবিতার অনুবাদ করেছেন 'সন্ধ্যার পূর্বে' নাম দিয়ে। কেউ কেউ এই অনুবাদকে মূল্যবান এবং মূলানুগ বলে মনে করেছেন। দুটির একটি বিশেষণ প্রয়োগ করতেও কিন্তু আমি প্রস্তুত নই। 'Lighted shade and shadowy light'-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'ছায়া মোলায়েম আলো মৃদু', 'Soft to sight' বোঝান হয়েছে 'আঁখি ডুবে যায়' এই শব্দ সমষ্টি দিয়ে, 'Flowers the rain has left to play' ভাষান্তরিত হয়েছে 'বাদল যে ফুল গিয়েছে থুয়ে', আর 'One whole hour' (Whole কথাটির তাৎপর্য লক্ষণীয়) হয়ে দাঁড়িয়েছে 'নিমেষের'। মৃত্যুর ভীষণতা প্রকাশ করতে গিয়ে স্থইনবার্ণ লিখেছেন—

Time that made us and will slay
Laughs at love in me and thee

সত্যেন্দ্রনাথ এর অনুবাদকে যথাসম্ভব লঘু করে ফেলেছেন—

মরণ আছে যে নয়ন তুলি
শেষে প্রেমের অযশ গাবে?

কিন্তু স্থইনবার্ণের 'Triads' নামক কবিতার অনুবাদটি ('ত্রিশ্লোকী') তুলনামূলকভাবে সফল হয়েছে। 'The word of the sun to the sky'-এর সার্থক ভাষান্তর 'অসীম ব্যোমেরে সূর্য্য কি কথা বলে?' কিন্তু 'The word of the wind to the sea'-কে বাংলা করতে গিয়ে 'সাগর কি কথা বলে গো হাওয়ার কানে' বললে নিশ্চয়ই ঠিক বলা হয় না। আর 'গো' কথাটি এর গম্ভীর মহিমাকে বিনষ্ট করেছে।

অরবিন্দ ঘোষের 'To the sea' ('সাগরের প্রতি') বা 'Bankim Chandra Chatterjee' এবং বিবেকানন্দের কবিতার অনুবাদ 'মৃত্যুরূপী মাতা' নিঃসংশয়ে সফল হয়েছে। সমুদ্র বিষয়ে

সত্যেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক প্রবণতা এ বিষয়ে কবিকে সহায়তা করে থাকবে। আসলে এ সব ক্ষেত্রে একটা কঠিন পৌরুষ সংহত ভাষারূপে ধরা পড়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ এখানে স্থির না থাকলেও এটিই তাঁর কবিচেতনার ভারকেন্দ্র।

॥ চার ॥

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম। সংস্কৃত বহু শব্দ অবিকৃত ভাবে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল থেকে। এ কারণে এই ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদের সুবিধা অনেক বেশী। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় আমদানী করতে যতটা যত্ন নিয়েছেন ততটা উৎসাহ দেখান নি সংস্কৃত কবিতার অনুবাদে। বেদ ও উপনিষদ থেকে যে কটি সূক্ত বা স্তোত্রের অনুবাদ তিনি করেছেন, তাদের মধ্যে কল্পনার উদাত্ত গাম্ভীর্য এবং দার্শনিকতা কিছু কিছু সফল ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। এই বৈদিক ইন্দ্রবন্দনা সঙ্গীতটি অনুবাদ হিসেবে উল্লেখযোগ্য—

রথের অগ্রে ইন্দ্রের তেজ, মোরা পূজা করি তায়,
আমরা অটল শত্রুর ব্যূহ ইন্দ্রেরি মহিমায় ;
তিনি আহ্বান শুনুন্ মোদের পূর্ণ রাখুন্ তূণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অধম ধনগুর্ণ।

ব্যাস বা বাল্মীকির কাব্য থেকে ইতস্তত অংশবিশেষের অনুবাদ মূল কবিতার সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যই সাধন করে না। ক্লাসিকাল যুগের সংস্কৃত কবিদের রচনা থেকে কিছু কিছু শ্লোকের অনুবাদ কবি করেছেন, কালিদাস থেকে অনুবাদের

সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কিছু বেশি হবে। এ ঘটনা কালিদাসের সৌন্দর্য-দৃষ্টির প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের আকর্ষণ প্রমাণ করে না। কালিদাসের কবিখ্যাতি এর জন্য দায়ী। কালিদাসের অনুবাদে কখনও কবি সফলতা দেখিয়েছেন, কখনও ব্যর্থ হয়েছেন। কালিদাসের শ্লোকে আছে—

অহিণঅমহু লোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিহ চুঅমঞ্জরিম্।
কমলবসইমেত্ত ণিব্বু ও মহুঅর বিস্মরিওসি নং কহং ॥

সত্যেন্দ্রনাথ এর অনুবাদে লিখেছেন—

নূতন মধুর লালসা-লোলুপ অলি হে
আম্রমুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুমিয়ে।
আজি কমলের দুয়ারে মাত্র বুলিয়ে
একেবারে তারে গেলে কি ভ্রমর ভুলিয়ে?

প্রাকৃতের শব্দলালিত্য অনুবাদে সম্পূর্ণত রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি কালিদাস থেকে অনূদিত 'পূর্বরাগ', 'রূপসী', 'ভ্রমরের প্রতি' কবিতাগুলি কালিদাসের কল্পনাজগতের কোন চিহ্নই বহন করে না।

ফারসী কবিতার অনুবাদে কখনও কখনও সুন্দর সাফল্য দেখিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ। হাফেজের 'প্রিয়া যবে পাশে', খুশ্‌হালের 'সাকীর প্রতি' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা চলে। ফারসী শব্দের রুচিসম্মত ব্যবহার এদের আবেদনকে বিশিষ্ট দেশকালের পরিবেশে জীবন্ত করে তুলেছে।—

প্রিয়া যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে;—
কেবা সুলতান্? তখন আমার গোলাম সে পদতলে।
... ...

মোল্লার কাছে মোর বিরুদ্ধে করিয়ো না অনুযোগ,
তাঁর আছে হায়, আমারি মতন সুরা-মত্ততা রোগ।
প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেক না হাফেজ! ছেড়না পেয়ালা লাল,
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসব কাল।

হাফেজের 'সাকীর প্রতি'-ও মদিরা-সাকী-অলঙ্কৃত বিশিষ্ট হাফেজীয় পরিবেশটি সার্থকভাবেই ফুটিয়ে তুলেছে। গজলের লঘু সুরটি কবি অনেকাংশে ধরে রেখেছেন এই পংক্তিগুলির মধ্যে—

সাকী! যদি জানো আস্বাদ মদিরার,
সুরা বিনা তবে আনিয়োনা কিছু আর;
ভজনা-গৃহের বেচিয়া মাদুর, দড়ি
প্রেম-সুরা আনো আনো তুমি সুন্দরী।
মাতাল! এখনো সংজ্ঞা যদি হে থাকে,
ওই শোনো, তোমা গোলাপের বন ডাকে;

হাফেজের রুবাইয়াৎগুলির অনুবাদও কোথাও কোথাও হাফেজের সুর ধরে রেখেছে। তবে ফারসী শব্দের ব্যবহারে আরও কিছু কার্পণ্য দূরে রাখা সম্ভব ছিল, উচিতও ছিল। ফারসী শব্দের সঙ্গে বাংলার ভাষাগত সম্পর্ক বহুদিনের। এই বিদেশি ভাষাটিও বাংলার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ দূরের নয়। কিছু সতর্ক থাকলে নূতন শব্দসম্পদ ফারসীর ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। ফারসী কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে এই সুযোগটি যেখানে কবি গ্রহণ করেছেন, সাফল্য সহজতর হয়েছে। নজরুল ইস্‌লামের হাফেজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরও সার্থকতা পেয়েছে। কবি ফারসী শব্দকে অনেক বেশি কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছেন। তা ছাড়া ছন্দের মধ্যেও এক বিশেষ ধরনের কারুকর্ম নজরুলকে সহায়তা করেছে সুরের দায়িত্বহীন লঘুতা ও ভাবানুভূতির মদির

ও বিহ্বল গভীরতাকে এক বৃন্তে বিদ্ধ করে প্রকাশ করায়—

ভাবনু, যখন করছে মানা
　　বন্ধুরা সব আগ্‌লে ভাঁটি,
দিলাম ছেড়ে, এবার ফুলের
　　মরশুমে ভাই শারাব খাঁটি।
ফুল-বাগিচার বুলবুলিরা
　　উঠ্‌ল গেয়ে—হায়রে বেকুব,
এমন ফাগুন, ফুলের ফসল
　　নাইক শারাব ? সকল মাটি !

সত্যেন্দ্রনাথের ও নজরুলের একটি করে রুবাইয়ের অনুবাদ পাশাপাশি রেখে পড়লে নজরুলের অধিকতর সাফল্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নজরুল লিখেছেন—

তোমার বিরহে গো আমি
　　কাঁদি মোমের বাতির চেয়ে
আরক্তধার অশ্রু ঝরে
　　মদের কুঁজোর মত বেয়ে।
পান-পেয়ালার মত আমি
হৃদয় যখন কৃপণ হেরি---
দূর বাঁশরীর বিলাপ শুনে
　　রক্তধারায় উঠি ছেয়ে।

সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে লিখেছেন—

তোমার বিরহে তপ্ত অশ্রু গলিছে বাতির মত
পেয়ালার মত গোলাপী আঁখির জল ঝরে অবিরত ;

হৃদয়েব, এই সঙ্কট-দিনে শুনি যদি বীণা-তান,
আঁখি-বারি রূপে হৃদয়-রক্ত ঝরে ব্যাকুলিয়া প্রাণ।

কখনও কখনও সাফল্য দেখালেও অমর অনুবাদক বলে সত্যেন্দ্রনাথকে অভিহিত করা চলে না।

সপ্তম অধ্যায়

হসন্তিকা

এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে এ রসের নাম আছে, কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে এ রসের বিশেষ স্থান নেই। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের রসালাপ শুনে আমাদের হাসি পায়, কিন্তু সে তাদের কথায় হাস্যরসের একান্ত অভাব দেখে। ও হচ্ছে পেটের দায়ে রসিকতা। বাংলার প্রাচীন কবিরা কেউ এ রসে বঞ্চিত নন। শুধু ভারতচন্দ্রের লেখায় এটি বিশেষ করে ফুটেছে। ভারতচন্দ্র এ কারণেও বহু সাধু ব্যক্তিদের কাছে অপ্রিয়। হাস্যরস যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় আরিস্টফেনিস থেকে আরম্ভ করে আনাতোল ফ্রাঁস পর্যন্ত সকল হাস্যরসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিসটেই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।

—প্রমথ চৌধুরী : ভারতচন্দ্র

॥ এক ॥

সত্যেন্দ্রনাথ কৌতুক রসের কবিতায় সফল হয়েছেন। বিশেষ করে এই কারণে তাঁর হাসির কবিতাগুলিকেও আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়রূপে গ্রহণ করেছি। অনেক কবি নেহাৎ

সাময়িক উত্তেজনাবশেই কৌতুককবিতা রচনা করে থাকেন। সমগ্র কবিপ্রকৃতির সমর্থনে এ-সব কবিতা সমৃদ্ধ নয়। কৌতুক দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের দিকে তাকাবার তাঁদের হয়ত কোন বিশিষ্ট প্রবণতা নেই। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথকে কিছুতেই এদের সমশ্রেণীভুক্ত মনে করা যায় না। কৌতুকশিল্পীর দৃষ্টিস্বাতন্ত্র্যে তাঁর অধিকার ছিল।

কৌতুকশিল্পী ব্যঙ্গরসের সাধনা করতে পারেন; আবার ব্যঙ্গদৃষ্টির মধ্যে অন্তর্নিহিত যে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও উদ্দেশ্য-মূলকতা, তা থেকে মুক্ত হয়ে রঙ্গের আধিক্যে উচ্চহাস্যের স্ফূর্তিতে মেতে উঠতে পারেন। মানুষের চিরন্তন দুর্বলতা হতে পারে তাঁর বিষয়, অথবা সমাজের বিশেষ কোন যুগের ক্রটি-বিচ্যুতি কবিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এ জাতীয় রচনায়। যে-কোন ক্ষেত্রেই কিন্তু রসটি কবির লক্ষ্য হওয়া চাই, সমাজসংস্কার নয়। যে ব্যঙ্গকবিতায় সমাজসংস্কার বাসনা তীব্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করে, কবির উদ্দেশ্য যেখানে অতিপ্রকট তার কাব্যমূল্য কম হতে বাধ্য। রসের আবেদনে তার দীনতা অনস্বীকার্য। ব্যঙ্গকবিতাও যে কবিতা, বিচারের কালে সেকথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

রোমান্টিক কল্পনা কৌতুকরস সৃষ্টিতে বড় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। জীবনের যে দিকে অতলস্পর্শী গভীরতা, সুদূরের প্রতি আকর্ষণ, তার অপর পিঠে রয়েছে স্বচ্ছ বস্তুবোধ, কল্পনার অতিবেকের ও বর্ণাঢ্য সৌন্দর্যচর্চার অন্তরালস্থিত অসঙ্গতি। কৌতুকস্রষ্টা আবেগের স্রোতে ভাসমান থাকেন না, তিনি তীরে দণ্ডায়মান দর্শক। (সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ বস্তুবোধ, রোমান্টিক সৌন্দর্যসাধনার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত চিত্তধর্ম কৌতুকশিল্পীর মন ও মেজাজের অধিকার তাঁকে দিয়েছে।) সত্যেন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক

কবিতায় সাফল্য তাই শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক ঘটনা নয়, তাঁর ব্যক্তি-স্বভাবের সঙ্গে এ বস্তু ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতকের শেষভাগে ব্যঙ্গ কবিতার প্রাচুর্য ঘটেছিল। যুগসন্ধির সেই বিশেষ পরিবেশে, একদিকে নব-যুগের নূতন জিজ্ঞাসাকে আত্মসাৎ করে বাংলা কবিতা নবপ্রাণে উচ্ছল হয়ে উঠল, অন্যদিকে সংশয় ও দ্বিধা এই ভাবাকুলতার মধ্যেই সৃষ্টি করল বক্রদৃষ্টির ও ব্যঙ্গবোধের। বিংশ শতকের প্রথমদিকে এই ধারা পূর্বের ন্যায় আর সতেজ রইল না ঠিকই, তবুও দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় বিশিষ্ট ব্যঙ্গকবি এই পর্বে দেখা দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী সনেট-আঙ্গিকে ব্যঙ্গবোধকে প্রকাশ করেছেন বিদ্যুতের দীপ্তি ও একাগ্র তীক্ষ্ণতায়। তবে প্রমথ চৌধুরীর শাণিত মননাতিরেক সত্যেন্দ্রনাথে নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবই তাঁর উপরে অধিক পড়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, গদ্যকথন ভঙ্গিকে কবিতার ছন্দের সঙ্গে যুক্ত করে, কখনও শব্দচয়নের বিশিষ্ট সচেতনতায় হাস্যরস সৃজনে যে সাফল্য অর্জন করেছেন সত্যেন্দ্র-নাথের পক্ষে সে আদর্শ অনুসরণের সুযোগ ছিল, অনুসরণও তিনি করেছেন এবং অনেকখানি সফলতার সঙ্গে।

সত্যেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু হিসেবে হিন্দুসমাজের কুসংস্কার, ধর্মসম্পর্কিত নানাবিধ বালসুলভ বিশ্বাস, সমাজে নারীর স্থান-সম্পর্কিত আদর্শ এবং নানা ধরনের ভণ্ডামীকে বেছে নিয়েছেন। সাহিত্যসংক্রান্ত কোনো কোনো মতামতও তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু কবিতায় ব্যঙ্গকে ভিত্তিতে মাত্র গ্রহণ করে রঙ্গের উচ্চহাস্যে কবি মত্ত হয়ে উঠেছেন। ভোজন রসিকতা, ভোজনবিষয়ক ভণ্ডামী ও লোলুপতা কয়েকটি কবিতায় হাস্যরস সৃষ্টিতে প্রযুক্ত হয়েছে। ভঙ্গির দিক থেকে তিনি প্যারোডির

রূপরীতিকে নিপুণতার সঙ্গেই কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। কখনও অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীররসাত্মক ভঙ্গিতে, কখনও বাউল স্বরে, কখনও কীর্তনের ঢঙে তিনি কবিতাগুলি লিখেছেন; বিষয় ও ভঙ্গির বৈপরীত্য অসঙ্গতি প্রকট করে তুলে হাস্যের কারণ হয়েছে। উদ্ভট (**wild**) কল্পনা, আজগুবি ভাবনা, অসঙ্গত তুলনা, প্রকাশ করবার জন্য ভাষা ব্যবহারের যে নিপুণতা কবি দেখিয়েছেন তা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। দেশি শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দের মেলবন্ধনে; ইংরেজি শব্দের সুচতুর ব্যবহারে, পুরাণ ইতিহাসের রাজ্য থেকে লঘুরসের কবিতার বিষয় সংগ্রহ করায় তিনি লক্ষ্য ভেদে অনেকটা সফল হয়েছেন।

॥ দুই ॥

সত্যেন্দ্রনাথ যে কবিতাগুলিতে সমাজসংস্কারের কোনো বিশিষ্ট উদ্দেশ্য না নিয়ে কৌতুকরস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তাদের আবেদন হয়েছে কাব্যোত্তীর্ণ। এদের উৎসে যদি কোনো ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব থেকেও থাকে, তবুও কবিতার ভাষ্যরূপ তাকে একেবারেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

'জবান-পচিশী' নামে যে কবিতাটিতে কবির নানা ভাষা চর্চার পরিচয় প্রকট হয়ে আছে, সেটি হাস্যরসে ক্ষীণ, পাণ্ডিত্য প্রকাশের অতিচাপে ক্লিষ্ট। আসলে এ কবিতায়ও কবি যুক্তি ও বুদ্ধিস্থিত চিত্তে প্রণয়কাতর নরনারীর ভাবালুতার প্রতি কৌতুক কটাক্ষ করতে চেয়েছেন. ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় কাউকে এখানে বিদ্ধ করতে চান নি। কিন্তু নানা ভাষার টুকরো উদ্ধৃতি একে কিছুমাত্র

সাফল্য লাভ করতে দেয় নি। এই রোমান্টিক ভাবকাতরতা এবং সৌন্দর্য-ব্যাকুলতাবিরোধী চিত্তই 'রাত্রি বর্ণনা' কবিতার সৃষ্টি-উৎসে সক্রিয়। সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণিত রাত্রি সুন্দরী নয়, ভদ্র নয়, মার্জিত ঔজ্জ্বল্য নেই তার অঙ্গকান্তিতে। ছন্দের চমকে এবং কল্পনার উদ্ভটতায় এর হাস্য চিত্ররচনাকে আশ্রয় করে পাঠকচিত্তে প্রভাব বিস্তার করেছে। কোথাও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের শিখা, কোথাও বাহিরে সাহেবী আচরণে অভ্যস্ত ব্যক্তির মনভরা কুসংস্কারের প্রসঙ্গ স্থান পেলেও ব্যঙ্গের আঘাত উদ্যত হয নি এদের প্রতি, নিদ্রা-তন্দ্রায় জড়িত কিঞ্চিৎ আজগুবির মিশ্রণে এরা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

তন্দ্রাবশে তক্তপোষে প্রচণ্ড পণ্ডিত চিৎ।
যুৎ পেয়ে করে চুরি টিকিব বিদ্যুৎ ভূত!
নির্-গোঁফের নাকে চড়ে ইঁদুর চৌ-গোঁফা তোফা!
গণেশ কচালে আঁখি, করে সুড় সুড় শুঁড়!
স্বপ্নে গ্যাখে ভক্তি ভরে খুলেছে সাহেব জেব!
পূজ্য হন্ গজানন তেড়ে শুঁড় নেড়ে বেড়ে!

দাম্পত্যপ্রেমের রোমান্টিক নিশাযাপনকে কিঞ্চিৎ স্থূলভাবে হলেও আঘাত দিয়েছে 'নাক-ডাকার গান', এবং এ আঘাতেও ঠিক ব্যঙ্গের ধার নেই।

কবির এ ধাবার বিশিষ্টতম কবিতাগুলি ভোজনবিলাসিতাকে অবলম্বন করেছে। ভোজননিপুণতাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ-রসিকতা বাংলা কবিতায় উনিশ শতক থেকেই চলে আসছে। তাকে রূপের বিচিত্রতা, এবং ভাবের নবীনতায় মৌলিক আস্বাদ দান করেছেন কবি। কোথাও প্যারোডির প্যাটার্ণে, কোথাও কীর্তনের সুরে, কোথাও বীররসাত্মক ভঙ্গির সহযোগে এই কবিতাগুলি কবিকে হাস্যরসাত্মক কবিতার রাজ্যে অমর স্থান

দিয়েছে। প্রথমেই নাম করতে হয় 'অম্বল-সম্বরা কাব্যে'র। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্যারোডি এই ছন্দের জন্মকাল থেকেই চলে আসছে। এই সব প্যারোডির দুটি প্রান্ত, একদিকে এই অভিনব ছন্দই হয়ে দাঁড়িয়েছে আক্রমণের বিষয়; অন্যদিকে 'heroic style' এই ছন্দের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলে প্যারোডিকারেরা মনে করেছেন, তাঁদের প্যারোডি তাই এক জাতের 'mock heroic style'-এর অনুশীলন করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ধারায় বিশিষ্ট কাব্য লিখেছেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায। তাঁর 'ভারত-উদ্ধার' চার সর্গে পূর্ণ ব্যঙ্গকাব্য। কাব্যরীতিতে সে-রচনা প্যারোডি, আবার সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের অতিকোমল সাম্রাজ্যবাদতোষণ সেখানে ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'অম্বল-সম্বরা কাব্যে' কোন আদর্শ বা আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করা হয় নি। অমিত্রাক্ষর ছন্দও এই কবিতা রচনার সময়ে সমাজে অতিউচ্চ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নেহাৎই কৌতুক-বাসনা এর জন্ম দিয়েছে। এর হাস্যে তাই বাধা নেই কোথাও। অমিত্রাক্ষর ছন্দের এরূপ সার্থক অনুকৃতি যে একান্ত লঘু এবং হাস্যরসাত্মক বিষয়ে ঘটানো সম্ভব ভাবতে বিস্ময় জাগে। ভারত উদ্ধারের বিষয়বস্তু বীররসাশ্রয়ী, যতই তা নকল ব্যাপার হোক না কেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাব ভঙ্গিতেই শুধু বীবরস, তৎসম শব্দেব প্রাচুর্য, গাম্ভীর্য ও ধ্বনিঝঙ্কার সৃষ্টিব চেষ্টা। বিষয়ের সঙ্গে অতিতীব্র বৈপরীত্যই এর হাস্যরসের মূল কারণ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কল্পনার অতিউদ্ভট ও বিচিত্র পথ-পরিক্রমা। মধুসূদনের কবিতায় কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রতিক্রিয়াজাত নানা চিত্র-সঙ্কলন তার আবেগানুভূতিটি পাঠকচিত্তে মুদ্রিত করে দিত। সেই পদ্ধতিরই অনুকরণ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ আজগুবি কল্পনায় ভর

দিয়ে। শম্ভুমালী অম্বল রান্না করেছে। তার ফলে প্রকৃতি ও মানবজগতে, পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে এমন কি দেবলোকে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সূচিত হল তার চিত্রে কবিতাটি পূর্ণ।

'সর্বশী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যানমূলক প্রখ্যাত কবিতা 'উর্বশী'র প্যারোডি করা হয়েছে। এখানেও বিষয়বস্তুটি ভোজনলোলুপতাকে আশ্রয় করেছে।

নহ ধেনু, নহ উষ্ট্রী, নহ ভেড়ী, নহ গো মহিষী,
হে দামুন্যা-চারিণী সর্বশী!
ওষ্ঠ যবে আর্দ্র হয় জিহ্বা সহ তোমারে বাখানি
তুমি কোনো হাঁড়ী-প্রান্তে নাহি রাখ খণ্ড মুণ্ডখানি,
জবায় জড়িত গলে লম্ফশূন্য সুমন্দ গতিতে
ব্যা-ব্যা-শব্দে নাহি চল সুসজ্জিত হননভূমিতে
দুষ্ট অষ্টমীতে।
গ্রাম্য দাগা-ষাঁড় সম সম্মানে মণ্ডিতা।
তুমি অখণ্ডিতা।

লঘু ভাবনার প্রকাশে যুক্তাক্ষরবহুল তৎসম শব্দের প্রাধান্য এবং তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশী লঘু শব্দের সংযোগ এর রূপরচনাকে হাস্যরসে অভিষিক্ত করে রেখেছে।

কীর্তনের ঢঙে লেখা 'কাশ্মীরী কীর্তন'ও ভোজনবিষয়ক কৌতুক কবিতা। বৈষ্ণবী কীর্তনের সুরে মাংস ভক্ষণের লোলুপ বাসনা প্রকাশ পাওয়ায় সাম্প্রদায়িক সংস্কারচিন্তার প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে। কিন্তু বাক্‌বিন্যাসে এই ব্যঙ্গবোধ গৌণ হয়ে পড়েছে; কথন-অতিরেকে কোথাও হাস্যের ভোজ ভোজনরসিকতাকে ছাপিয়ে গিয়েছে, ঈষৎ আজগুবি কল্পনার মিশ্রণ তাকে করে তুলেছে আরও আকর্ষণীয়।

আহা পাঁটার ছেঁচকি ; পাঁটার ঘণ্ট,
পাঁটা-পোড়া পাঁটা ভর্জিত,
আর পাঁটা-সিদ্ধ ও পাঁটার মালপো
থরে থরে হের সজ্জিত।
একি পাঁটার কালিয়া পাঁটারি হালুয়া
পুলিতে পাঁটার ছাঁই যে ;—

লোলুপের রসসিক্ত রসনা যেন এই বিবিধ আয়োজনের কল্পনায় মত্ত হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে পৌরাণিক প্রসঙ্গের উল্লেখে ভাবনার বন্ধনহীন উদ্ভটতা হাস্যরসকে দুর্বার করে তুলেছে—

এই শীত-নিবারণ লোমশ ছাগের
মাংস—পুরাণে শুনি গো
নাকি গোপনেতে উদরস্থ করিয়া
হইল লোমশ-মুনি গো।
তার গায়ে গজাইল কাশ্মীরী শাল—
জামিয়ার বিনা-খর্চায়,

এবং প্রত্যেক স্তবকের শেষের কোবাসের তাল যেন climax-এর কাজ করেছে।

'হরফ রিপাব্লিকে'ও রঙ্গরসই মুখ্য। বাংলা ছাপায় লাইনো-টাইপের আবির্ভাব নিয়ে কিছু কৌতুক করেছেন কবি। রোজার ডাকে ভূতের মত 'ঙ'-'ঞ'র দলের ছুটে আসার ছবিটি এখানে হাসির কারণ হয়ে উঠেছে—

রঙ্‌গে এর গাঙের ফড়িঙ্‌ কনুঞ্‌ উঁচু করে,
রাঙা ফুলের মধ্যে ঝিঁঝিঁ শুঞো ঘোরায় জোরে ;
ডাঞ্‌ণী ডেঞে পিঁপড়ে এলেন বুকে হেঁটে হেঁটে,
উচ্চিঙ্‌ড়ে উদয় হলেন গাছের বাকল কেটে ;

ডোঙায় এলেন কোঙা হয়ে গোসাঞ্‌ এবং মিঞা,
ঠোঙায় এল ঝিঙা-ভাজা, ডিঙায় এল টিঞা ;

'ছাগলাদাড়ি' বা 'রামপাখী'তে শুদ্ধকৌতুকে কবি মশগুল। তবে এদের উৎকর্ষ অধিক নয়।

॥ তিন ॥

ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় সত্যেন্দ্রনাথ সেখানেই রসসৃষ্টিতে সফল হয়েছেন যেখানে আঘাতের তীক্ষ্ণতা কম, যেখানে কল্পনা উদ্ভট ও অসম্ভবকে প্রশ্রয় দিয়েছে, অসঙ্গতিকে বড করে তুলেছে, লঘুকে গভীর সুরে ব্যক্ত করেছে। সত্যেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন প্রধানত রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কুসংস্কারকে এবং ক্বচিৎ মানব-চরিত্রের নানাবিধ দুর্বলতাকে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশে কাব্য এবং নাট্য-প্রহসনে ব্যঙ্গ রচনার জোয়ার এসেছিল বলা যেতে পারে। এর কারণ অনুসন্ধানও অসম্ভব নয়। পুরাতন জীবনবোধ এবং নবীন শিক্ষা ও চিন্তার সংঘর্ষে বাঙালী জাতির মনোজগতে তখন যুগসন্ধি। ব্যঙ্গ রচনার পক্ষে লেখকের ব্যক্তিগত মেজাজ, জীবনদৃষ্টির বিশিষ্ট বক্রভঙ্গী যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি যুগপটভূমির বিশিষ্টতারও তাৎপর্য আছে। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাঙালীর চিন্তাজীবনে পরিবর্তন ঘটেছে। ব্যঙ্গ রচনায় পূর্বানুরূপ জীবন্ত পরিবেশ আর ছিল না। একালের ব্যঙ্গ রচনার ধার তাই স্বাভাবিকভাবেই কমে গিয়েছে। এ সময়কার মুখ্য ব্যঙ্গ কবিতা রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায়ও রঙ্গের প্রাচুর্যের দ্বারা ব্যঙ্গের ধারের অভাব পূরণ করা হয়েছে।

'শ্রীশ্রী *টিকিমঙ্গল*' সত্যেন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্নমঙ্গলে'র

প্রভাব আছে। সমকালে নব্য হিন্দুদের বিজ্ঞান বুদ্ধির যুক্তি পুরাতন সংস্কারগুলিকে নব তাৎপর্যে মণ্ডিত করতে চাইছিল, এঁদের আক্রমণটা তারই বিরুদ্ধে। কখনও কখনও ব্যঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

কহ—কুড়ি দরে তুমি মুর্গী কিনিতে ?
বয়স যখন কাঁচা ?
বাপু! অধম-তারণ টিকি রাখ মাথে
ভয় কি তোমার বাছা ?
দেখ ধর্ম মোক্ষ অর্থ ও কাম
সকলই টিকির ন্যাওটা
ওগো বেচাল ঘটিলে টিকি বিনা আর
কে ধরে তখন ম্যাওটা ?

কিন্তু এ কবিতায়ও ব্যঙ্গের ধার বঙ্গের উচ্চহাস্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়েই বিষয়োত্তীর্ণ হাস্যরসের আধার হয়ে উঠেছে। টিকির জন্মকল্পনায় পৌরাণিক বৈদিক পরিবেশের লঘু অনুকরণ লক্ষণীয়—

আহা ছিল চইতন-চুট্‌কি আদিতে
টিকি হয় যার বংশ।
তারে 'চই' 'চই,' করি আদিম আঁধারে
ডাকিল সপ্ত-ঋষি গো,
তাই 'চইতন,' নাম হইল তাহার
যে নামে ভরিল দিশি গো।

টিকির ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যে ধরনের উদ্ভট (wild) কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন, মাঝে মাঝে ছদ্ম গবেষণার যে ভঙ্গী দেখিয়েছেন (ব্রহ্মার টিকি নাভির মৃণাল, গণেশের শুঁড়ময়ী টিকি, সূর্যের টিকি রাহুর মুঠায়, আদি-বৈষ্ণব গরুড়ের টিকি তার টিকল

নাসিকা, কানুর টিকি তৃতীয় চরণ এবং হনুর টিকি তার পুচ্ছ ; হাস্যরস তাতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ভাষা-বিষয়ে নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন কবি। একান্ত লঘু দেশি শব্দ, ইংরেজি শব্দের সঙ্গে সহজ ভোজের আসন পেতেছে, তৎসম শব্দের সঙ্গে নিঃশঙ্ক চিত্তে হাত ধরাধরি করে চলেছে। হাস্যরস সৃজনে এদের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি প্রতি স্তবকের সমাপ্তিতে 'দোহার—কী গোহার' নামে যে ধূয়ার আয়োজন করা হয়েছে —

এ—রি—মুম্ !—তেরি না !—
টিকি রাখ্ !—দেরি না আ-আ।

তার অবদানও যথেষ্ট।

'সাফ্রোজেট-কৃত শ্যামাবিষয়ক'-এ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। কবিতার কেন্দ্রমূলে পৌরাণিক ভাবনা, কিন্তু দেহরূপে অনেকগুলি ইংরেজি শব্দের ব্যবহার এবং বাউল সুরের সংযোগ কবিতাটিতে হাস্যরসসৃজনে সহায়তা করেছে। 'পিজরাপোলে-ধৃত ভগবতী বিষয়' কবিতায় বিরুদ্ধবাদীদের সংস্কারমূঢ় ভক্তিভাবনাকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। এখানেও ব্যঙ্গের প্রত্যক্ষতা ছদ্ম যুক্তির প্রয়োগে হাস্যমুখর হয়ে উঠেছে। ভগবতী কি ভাবে গরুমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন কবি যেন বেশ গম্ভীরভাবেই তা বিবৃত করতে অগ্রসর হয়েছেন—

সিংহ তোমার শিং হয়েছে—
সদাই পাহাবায় রয়েছে,
বিনোদ বেণী ল্যাজ হয়েছে
লাজের মাথা খেয়ে।

'দশ-বেতর স্তোত্র'ও ঠিক একই জাতের কবিতা। ধর্মবোধের কুসংস্কারকে কবি আঘাত করতে চেয়েছেন। কখনও ব্যঙ্গ যথেষ্ট

প্রত্যক্ষ। মাতৃঘাতক পরশুরামকে অবতার বলে গ্রহণ করায় কবি বেশ উচ্চকণ্ঠেই ধিক্কার দিয়েছেন—

মায়ের মাথায় কুড়ুল মারিয়া অবতার হ'লে পুত্র !
আহা ! লীলা হেন কবে কে দেখেছে ?—কুত্র ?
দেবতা বনিলে,—দেখিলে না জেল্ !
বলিহারি যাই তোমারি।

কিন্তু এ কবিতায়ও প্রধানত উদ্ভট কল্পনা হাস্যরসের কারণ হয়েছে। ধর্মমূলক বিষয়ের গাম্ভীর্যকে কবি ভোজনরসিকের লঘু সরসতায় রূপান্তরিত করে কৌতুক করেছেন মৎস্য অবতার, কূর্ম-অবতার এবং বরাহ অবতারের বর্ণনায়—

পোলাওয়ে করেছ স্বধাময় আর কালিয়ায় অতি 'টেষ্ট্‌ফুল্‌' !
মারিয়া রেখেছ সৌরভে অহো ! বিল্‌কুল !
দেবতা ! হইলে মছ্‌লি বেবাক্ !
বলিহারি যাই তোমারি।

'আদর্শ বিয়ের কবিতা'য় বিশুদ্ধ কৌতুকের সঙ্গে আমাদের সমাজের বরপক্ষের অর্থকরী মনোভাবের প্রতি ব্যঙ্গ সংযুক্ত হয়েছে। এই কবিতার 'প্রথম পক্ষে', 'দ্বিতীয় পক্ষে', এবং 'তৃতীয় পক্ষে'র জন্ম ব্যঙ্গ-চেতনায়, কিন্তু বাচনভঙ্গীতে রঙ্গকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

'মদিরামঙ্গল' সংস্কারমুখী প্যারোডি। কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের লঘু ও বক্র উল্লেখে উচ্চ হাস্যের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু 'সিগারসঙ্গীতে' ব্যঙ্গের কেন্দ্রটি দুর্লক্ষ্য, যেমনি আজগুবি বা উদ্ভট কল্পনার যে লীলা অন্যত্র তাঁর কবিতায় হাস্যরস সৃষ্টি সম্ভব করে তুলেছে এখানে তার একান্ত অভাব। সর্বোপরি ভাষার বিশিষ্টতাও এ কবিতায় কবিকে সাহায্য করে নি।

সাহিত্যবিষয়ক মতসংঘর্ষ একাধিক কবিতায় ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। 'শ্রীশ্রী বস্তু-তন্ত্রসারঃ' কবিতায় সাহিত্যে বাস্তববাদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেছেন কবি। অসঙ্গত তুলনার লঘুতায় এখানেও ব্যঙ্গের প্রত্যক্ষতা আচ্ছন্ন হয়েছে। রচনার উৎকর্ষে 'অ!' অনেক বেশী মূল্যবান। চুট্‌কির সমর্থনে এখানে কবি এগিয়ে এসেছেন। লঘু ক্ষুদ্রাকৃতি রচনার প্রতি কবির আকর্ষণ এই ব্যঙ্গ কবিতার জন্ম দিয়েছে।—

ওগো চুট্‌কি লিখিলে থেকে যাবে মনে
আরসোলা-চাটা-ভয়,
হয় কীর্তি-লোপের সুবিধা বেজায়,
ছোট আর লেখা নয়।
লেখ এমন গ্রন্থ যাহা পাঁজাকোলা
করেও না যায় তোলা,
আর চারি যুগে চাটি ফুরাতে পারে না
দুনিয়ার আরসোলা।
ওরে লেখ ব্যাসকুট দাঁতে বিস্কুট
আদা জল খেয়ে ল'
শুধু বিবাট হলেই হইবে কেতাব
অজর অমর।—
(কোবাস্)···অ!

সত্যেন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক কবিতার সংখ্যা অধিক নয়, কিন্তু এগুলির বেশির ভাগই আস্বাদের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির বিশিষ্টতা, উদ্ভট কল্পনাকৌতুক, ভাষা-ব্যবহারের নিপুণতা এই সাফল্য এনে দিয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্বকর্মার কর্মশালা

অলঙ্কারান্তরাণি হি নিরূপ্যমাণ—দুর্ঘটনান্যপি রস-সমাহিত-চেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেঃ অহংপুর্বিকয়া পরাপতন্তি।

—আনন্দবর্দ্ধন : ধ্বন্যালোক

ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক, ডাক্তারের মাপকাঠি কায়ামূলক, আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ামূলক। ঐতিহাসিককে রচনা করতে হয় না, তাই তার মাপকাঠি ঘটনাকে চুলচিরে ভাগ করে দেখিয়ে দেয়, ডাক্তারকেও জীবন্ত মানুষ রচনা করতে হয় না, কাজেই জীবনমৃত ও মৃত মানুষের শবচ্ছেদ করার কাজের জন্য চলে তার মাপকাঠি, আর রচয়িতাকে অনেক সময় অবস্তুকে বস্তুজগতে, স্বপ্নকে জাগরণের মধ্যে টেনে আনতে হয়, রূপকে রসে এবং রসকে রূপে পরিণত করতে হয়, কাজেই তার হাতের মাপকাঠি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের, রূপকথার সোনার রূপোর কাঠির মতো অদ্ভুত শক্তিমান।

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিল্প ও দেহতত্ত্ব

॥ এক ॥

সত্যেন্দ্রনাথের রূপায়ণ পদ্ধতির নানা দিক নিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে পূর্বে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। এখানে সামগ্রিকভাবে এই প্রশ্নটির বিচারের চেষ্টা করব।

প্রথমেই কবির ছন্দের প্রসঙ্গে আসা যাক। কবি ছন্দের ঐন্দ্রজালিক বলে যে-খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা তাঁর কবি-কর্মের রসোত্তীর্ণতার কতখানি পরিচয় বহন করে? ছন্দ-শব্দ-চিত্র--সঙ্গীত-ভাববস্তু এ সমস্ত কিছুর প্রাণদৃপ্ত সমন্বয়েই—কেবল সমন্বয়েই নয়, একান্ত এবং অচ্ছেদ্য সম্বন্ধেই সত্যকার রসসিদ্ধ কবিতার জন্ম। এসব বিচিত্র উপকরণের স্বতঃস্ফূর্ত সমবায়-সম্বন্ধ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে শুধু ছন্দ-নির্মাণের কৌশলই যদি প্রধান হয়ে ওঠে তবে কাব্য-সার্থকতা বিষয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে। সত্যেন্দ্র-নাথের কবিতায় ছন্দের পরীক্ষা চলেছে বিচিত্র পথে। সংস্কৃত কাব্যের নানা ছন্দ—যেমন, রুচিরা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, পঞ্চচামর, শার্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি—বাংলা কাব্যে তিনি আমদানী করেছেন। এদের সাফল্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় কবির এই সাধনা বাংলা কাব্যে ছন্দসম্পর্কিত কোনো নূতন ধারা-সৃষ্টির সার্থকতা আনে নি।

ছন্দ নিয়ে মধুসূদনের পরীক্ষা ও অমিত্রাক্ষরের আবিষ্ক্রিয়ার সঙ্গে এর পার্থক্যটি অনুধাবনযোগ্য। অমিত্রাক্ষরের দর্পণে মধুসূদনের প্রাণসত্তার স্বচ্ছ প্রতিফলন ঘটেছে, কবির নিজ চিত্তবিবিক্ত একটা পরীক্ষা মাত্র তা নয়। কবির জীবন-জিজ্ঞাসা এবং কাব্যবোধ এর ছন্দের শরীর আশ্রয় করে প্রাণের মতই জড়িয়ে রয়েছে। আবার, পর্বে পূর্বে রবীন্দ্রকাব্যে ছন্দ-জিজ্ঞাসায় যে আশ্চর্য বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা তাঁর নিগূঢ় কবিপুরুষের তথা তাঁর সমগ্র কাব্যধারার সূত্রে তাৎপর্যবহ। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দে ল্যাবোরেটরীর উৎসাহী ছাত্রের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার পরিচয় যতটা ফুটেছে, প্রাণগত উৎকণ্ঠার স্পর্শ ততটা লাগে নি। কবির নিজ চিত্তকেন্দ্রে স্থিত থাকবার অক্ষমতা, বহু বিচিত্রের পথে

পথে ভাবকেন্দ্রচ্যুত পরিক্রমাই প্রধানত এর জন্য দায়ী। অবশ্য নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেও কবির প্রধান ঝোঁকটি দৃষ্টি এড়ায় না। বাংলা ভাষার উচ্চারণে হসন্ত ধ্বনির মর্যাদা কবি সহজ মন দিয়ে স্বীকার করেছেন।

এ বিষয়ে মোহিতলালের বক্তব্য অবশ্যস্বীকার্য, "সত্যেন্দ্রনাথ এই হসন্তযুক্ত অক্ষরকেই (যথা—তুম্, দেব্, সর্, নার্) গুরু এবং সকল স্বরান্ত বর্ণকে (যথা…তা, কে, কি, প, স) লঘু ধরিয়া বাংলা কবিতায় সংস্কৃতের অনুকরণে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। উহা ছড়ার ছন্দ নয় বটে, তথাপি, কথ্য বাংলা ভাষার উচ্চারণ বজায় রাখিয়াই—আমাদের কণ্ঠের হসন্তপ্রবণতাকে কাজে লাগাইয়া, তিনি এক নূতন ছন্দধ্বনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বাংলা কবিতায় যে অভিনব ধ্বনিবৈচিত্র্য ঘটিয়াছে, তাহা অতিশয় শ্রুতিসুখকর এবং শিল্প হিসাবে উপভোগ্যও বটে, কিন্তু সেই ছন্দ কৃত্রিম। তাহাতে খাঁটি কবিতা অপেক্ষা 'চিত্রকাব্য' রচনাই সম্ভব। কারণ বাংলা কাব্যের উচ্চারণে, আত্ম ঝোঁককে কোনক্রমেই আর কোথাও সরাইয়া লওয়া যায় না, এজন্য গুরু-লঘু স্বরসন্নিবেশকালে, সেই ঝোঁককে লঙ্ঘন করিয়া—ছন্দের আবশ্যক-মত, যে কোন স্থানে স্বরবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে, তাহাতে ছন্দের কারুকলা বা কৃত্রিম ধ্বনিচাতুর্যই প্রধান হইয়া উঠে—কাব্যপ্রেরণার আন্তরিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। তথাপি, সত্যেন্দ্রনাথ বাঙালী কবির একটা বহুকালের আকাঙ্ক্ষা কতকটা সহজ উপায়ে মিটাইতে চাহিয়াছিলেন।" এই ছন্দচর্চার ফলে তাঁর গুরুগম্ভীর বিষয় এবং গভীর রসের বহু কবিতাও শেষ পর্যন্ত শিল্পনির্মিতির স্তরে উঠতে পারে নি। এক ধরনের লঘুচপল লীলালাস্য তাঁর ছন্দে প্রায়ই প্রশ্রয় পেয়েছে। কবির একপ্রকার শিশুসুলভ মনোভঙ্গী এবং

খেয়ালী কল্পনামুখী বিশেষ প্রবণতার ফলেই এরূপ ঘটেছে বলা যেতে পারে। অবশ্য সনেটরচনায় সত্যেন্দ্রনাথ অনেকগুলি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন। সনেটে বা অন্যত্র গম্ভীর রসের কবিতায় পয়ারের প্রচলিত পংক্তিতে পংক্তিতে অন্ত্যানুপ্রাসরীতি পরিহার করে বিকল্প পংক্তিতে মিল দিয়ে বা অন্যরূপে বিচিত্রতা আনবার চেষ্টা এবং আঠারো মাত্রায় দীর্ঘ চরণ ব্যবহার ধীর লয়ের বিভ্রম আনতে সমর্থ হয়েছে, গাম্ভীর্য এসব ক্ষেত্রে অপ্রকাশিত থাকে নি।

ঐতিহাসিক বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাবে, বাংলা ছন্দের ভবিষ্যৎকে স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত কোনো দানের দ্বারা প্রভাবিত করতে পারেন নি সত্যেন্দ্রনাথ। আমাদের কাব্যসাহিত্যে ছন্দের ইতিহাসে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর বা সনেট, রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ার, মুক্তক বা পদ্যছন্দ বাংলা কবিতার ছন্দে ও ভঙ্গীতে ভবিষ্যতের পথনির্মাণে যে গতি ও শক্তি সঞ্চারিত করেছে, সত্যেন্দ্রনাথ সেরূপ কোনো গৌরব দাবি করতে পারেন না।

সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণে সাফল্যলাভ করেছেন। প্রাগাধুনিক যুগের কবি ভারতচন্দ্র নানাবিধ সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় আমদানী করতে চেয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বলদেব পালিতও এই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতি বজায় রেখে এরূপ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ভাবলেন, "বাংলায় দীর্ঘস্বর নাই থাক। যুক্তাক্ষর তো আছে। —যুক্তাক্ষরের পর্যায়বিন্যাসের সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনিবৈচিত্র্যের গতিক্রম প্রবর্তিত কর।" কবি স্বরান্ত অক্ষরকে (বাংলায় যা সাধারণত একমাত্রা) লঘু এবং হলন্ত অক্ষরকে (যা সাধারণত দুই মাত্রা) গুরু ধরে এই অসাধ্যসাধন করলেন ; বাংলায় উচ্চারণরীতির ব্যতিক্রম

হল না, সংস্কৃত ছন্দও অবিকৃত ভাবেই প্রচলিত হল। কবি সংস্কৃত ছন্দের মত কিছু কিছু ইংরেজি ও ফরাসী ছন্দের অনুকরণও বাংলা ভাষায় করেছিলেন। কিন্তু সে সব চেষ্টা কবির কৌতূহলী মনের নানামুখী গতির পরিচয় দেয়। অন্য কোনো দিক থেকে তাদের কোনোরূপ গুরুত্ব নেই। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণের ভিত্তিতে যে ছন্দচেতনা কবির জন্মেছিল সেই আদর্শ নবীন বাংলা ছন্দ-ভঙ্গীতে সত্যেন্দ্রনাথ বহুক্ষেত্রে অবলম্বন করতে চেয়েছেন। মোহিতলাল সে বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন।

সংস্কৃত ছন্দের মধ্যে মন্দ্রাক্রান্তা, মালিনী, রুচিরা, শার্দুল-বিক্রীড়িত, পঞ্চচামর প্রভৃতি ছন্দের কবিতা তিনি লিখেছেন। এবং মন্দাক্রান্তা বা মালিনীতে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও তিনি দেখিয়েছেন। একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। 'যক্ষের নিবেদন' মন্দাক্রান্তার সফল অনুসরণের দিক থেকে স্মরণযোগ্য কবিতা। সংস্কৃত মন্দাক্রান্তায় সতর অক্ষর। চতুর্থ, সপ্তম এবং সপ্তদশ অক্ষরের পরে যতি। প্রথম চার অক্ষর গুরু, তারপরে পাঁচ অক্ষর লঘু, আবার দু অক্ষর গুরু, এক অক্ষর লঘু, দু অক্ষর গুরু, এক অক্ষর লঘু, দু অক্ষর গুরু—

সূর্-যের্-রক্-তিম্-ন-য়-নে-তু-মি-মেঘ্-দাও-হে-কজ্-জল্-পা-ড়াও-ঘুম্
বৃষ্-টির্-চুম্-বন্-বি-থা-রি-চ-লে-যাও-অং-গে-হর্-যের্-প-ড়ুক্-ধুম্

॥ দুই ॥

সত্যেন্দ্রনাথ কবিতার দেহগঠনে সচেতন দৃষ্টি রেখেছেন। অঙ্গসৌষ্ঠবে তাই বড় ত্রুটি ঘটে নি। কিন্তু দেহে-প্রাণে যে অচ্ছেদ্য মিল ভাল কবিতায় প্রত্যাশিত সে সিদ্ধিতে কবি সর্বদা পৌঁছুতে পারেন নি।

গীতিকবিতায় ভাব ও সুরের যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন সত্যেন্দ্রনাথে সর্বদা তা রক্ষিত নয়। (এ ঐক্য যে সরল ও অতি প্রত্যক্ষ হবে এমন দাবি করি না, জটিল হলেও ঐক্য-বোধ না জন্মালে এদের আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য।) সত্যেন্দ্রনাথে এমন কবিতার সংখ্যা কম নয় যেখানে বিষয়কে অবলম্বন করলেও স্তবকে স্তবকে বিচ্ছিন্ন নানা ভাবমূর্তি প্রশ্রয় পেয়েছে। 'সমুদ্রাষ্টক', 'হিমালয়াষ্টক' প্রভৃতি কবিতায় স্তবক নির্মাণে বাহিরের প্রসাধনের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চোখে পড়ে। কখনও স্তবকগুলি বরফীর মতন হয়ে উঠেছে (গ্রীষ্মের সুর), কখনও পথের মত সরু ও দীর্ঘ হয়ে চলে গিয়েছে (পাল্কীর গান)। মিলের ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন নানাধরনেব বিচিত্রতা, পয়ার-ত্রিপদীর প্রচলিত রীতি কবিকে যে একেবারে খুশি করতে পারে নি—এ খুবই স্পষ্ট।

সনেট-আঙ্গিকের প্রতি কবির প্রবণতা অনেকগুলি ক্ষেত্রে সাফল্য এনেছে। মধুসূদন প্রবর্তিত সনেটের চৌদ্দ মাত্রার চরণগুলি তাঁর কাছে যথেষ্ট দীর্ঘ বলে মনে হয় নি। তিনি আঠার মাত্রার চরণের আশ্রয় নিয়েছেন। সনেটে অন্ত্যানুপ্রাসের যে বিচিত্রতার সুযোগ থাকে তার সঙ্গে চরণগুলির এই দৈর্ঘ্য মিলিত হয়ে বিলম্বিত লয়কে আরও বিলম্বিত করে তুলেছে। এদের মাধ্যমে গাম্ভীর্যের ভাব ও ঘনীভূত আবেগ সুন্দর ব্যক্ত করেছেন কবি (মহানদী, রূপ-নারায়ণ, সমুদ্র-পান, অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যেখানে কবি লঘু সুরের চর্চা করেছেন সেখানে চৌদ্দমাত্রার চরণকেই পর্যাপ্ত বলে তাঁর বোধ হয়েছে (যেমন, ইৎমৎ উদ্দৌলা)। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। অষ্টম-ষড়কের সম্বন্ধ নির্ণয়ে তিনি পেত্রার্কা-পদ্ধতিই সাধারণত অনুসরণ করেছেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে কিন্তু চৌদ্দ চরণের অখণ্ডতা রক্ষিত হয়েছে।

দীর্ঘাকৃতি কবিতায় কবি সাধারণত ব্যর্থ হয়েছেন। অবশ্য লঘু খেয়ালী সুরের আলাপ যেখানে করেছেন সেখানে কিঞ্চিৎ দৈর্ঘ্য (তাও খুব বেশি নয়) অসুবিধার সৃষ্টি করে নি। গভীর অনুভূতি ও গম্ভীর ভাবের কবিতা যেখানে দীর্ঘ চেহারা নিয়েছে সেখানে অনিবার্যভাবে ব্যর্থতা এসেছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে কবির গম্ভীর-গভীর সার্থক যে সব কবিতার উল্লেখ করেছি, লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তাদের অধিকাংশই আকারে ক্ষুদ্র; অনেকগুলি সনেট, যেগুলি সনেট নয় সেগুলিও প্রায়ই চল্লিশ-পঞ্চাশ পংক্তির কম ছাড়া বেশি নয়।

॥ তিন ॥

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার রূপরীতিগত দুটি বিশিষ্টতা নিয়ে কবিতাবলী প্রসঙ্গে নানা কথা বলা হয়েছে। এক। বহু বিষয়ক তথ্যের উল্লেখ। দুই। বিভিন্ন বস্তুর তালিকা। বিশিষ্টতা হলেও এদের কবিজনোচিত বলা চলে না।

কবিতায় বস্তুরূপ প্রত্যাশিত, বস্তুর নাম নয়। জ্ঞানবিজ্ঞান কবির মননকে উদ্বুদ্ধ করে ভাব-ভাষা-ছন্দ ও চিত্রকল্পকে রঞ্জিত করলেই কবিতার সার্থকতা, অন্যথায় তারা বর্জনীয়। এই দুই প্রবণতা বহু ক্ষেত্রে কবিকে সাফল্যভ্রষ্ট করেছে।

কিন্তু চিত্রকল্প রচনায় সত্যেন্দ্রনাথের সার্থকতা পূর্বোক্ত প্রবণতার বাধা এড়িয়েও আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। কবির হাতে রঙ-রেখায় ছবি আঁকবার ক্ষমতা ছিল। তবে এই ক্ষমতা প্রাণের তাগিদ ছাড়া অন্যত্র আত্মপ্রকাশ করত না। কবি যেখানে লঘু-সুরে বীণার তার বেঁধেছেন হাতের তুলিও সেখানে বহুমুখে রঙের

নেশায় মেতেছে। কবি যেখানে যৌবনের বীর্যের গান গেয়েছেন রৌদ্রঝরা কাঠিন্য সেখানে চিত্রের বুকে সংহত হয়ে ধরা দিয়েছে। কিন্তু রাজনীতির কথা, ইতিহাস বা পুরাণ প্রসঙ্গে কবির ভাষা বিবৃতিমুখ্য হয়ে পড়েছে, তথ্যপ্রধান বক্তৃতার পথ ধরেছে, ছবি সেখানে হারিয়ে গিয়েছে।

রুদ্রের সাধনায় কবির ভাষাচিত্র ও কল্পনা দাহনবর্ষী দৃপ্ত সূর্য, তরঙ্গমুখর সমুদ্রের মহান গাম্ভীর্য এবং মৃত্যুর অমাবস্যা-অন্ধকারকে সবচেয়ে বেশি আশ্রয় করতে চেয়েছে। এদের চিত্রকল্পে একটা third dimension বা ঘনত্বের বিভ্রম যেন সৃষ্ট হয়। বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। লঘুতার সাধনায় কবি যে বিচিত্র পরীক্ষা চালিয়েছেন শব্দচিত্র তার মুখ্য বাহন হয়ে দেখা দিয়েছে। এর যেখায় কোথাও গভীরতা নেই, তেমনি অস্পষ্টতাও নেই। রঙে বিচিত্রতা আছে, কিন্তু কোথাও তা ঘন হয়ে ওঠে নি, একটা হাল্কা লীলাময়তা তার সর্বত্র ব্যাপ্ত। অথচ এই চিত্রধর্ম সম্পূর্ণ প্রকাশিত। কোনো দূরের রহস্যজগতের ইঙ্গিত এদের মধ্য দিয়ে ভেসে আসে না। এই সব কবিতার রূপাঙ্কনে কবি যে বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, কখনও শব্দের ধ্বনিকে চিত্রে রূপান্তরিত করেছেন, কখনও শব্দের চিত্রধর্মকে বিলুপ্ত করে শুধু ধ্বনির ঝঙ্কার কানে বাজাতে চেয়েছেন, কখনও রঙের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছেন, কখনও দীপ্তি দেখে ভুলেছেন, কখনও তাল শুনে মত্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা আমি করেছি।

সত্যেন্দ্রনাথের শব্দচিত্রে ক্বচিৎ এরূপ উদাহরণ মিলবে যেখানে বস্তুরসনির্যাস ব্যঞ্জিত হয়েছে, বস্তুরূপ বিগলিত হয়ে ভাবরসে রূপান্তরিত হয়েছে, সীমাবদ্ধ খণ্ডতার ছবি অখণ্ড অসীমের দ্যোতনা

এনেছে। যেখানে তাঁর ভাষা-চিত্র সার্থক সে ক্ষেত্রেই তিনি বস্তুকে মর্যাদা দিয়েছেন। লঘু কল্পনার ছবিতেও বস্তু থেকে নিরঙ্কুশ মুক্তির (খাঁটি কল্পনায় যা থাকে না) বাসনা শেষ পর্যন্ত রঙে-রেখায়-সঙ্গীতে বস্তুলোককেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া কবির ব্যক্তিপ্রাণের কামনা-বাসনা-আকুতি বীর্যকঠিন যৌবন-চিত্রকে অনুরঞ্জিত করেছে, লঘু খেয়ালী চিত্র পিছনের সতেজ তরুণ প্রাণের খুশির ভিত্তি রচনা করেছে, কিন্তু এই ধরনের শব্দ-চিত্র ছবিকে বস্তুরূপ থেকে ভ্রষ্ট করে নি।

॥ চার ॥

রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণ প্রভাবকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন সত্যেন্দ্র-নাথ। অজস্র কবিতা তিনি লিখেছিলেন। বিচিত্র বিষয়ের চর্চার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনার রাজ্যটি মোটামুটি এড়িয়ে যেতে তিনি চেয়েছেন, রূপরচনায়ও তিনি একটি পথ খোঁজার সাধনা করেছেন। (যদিও আদৌ সচেতন ভাবে নয়, সচেতন চেষ্টা হলে সেই আকর্ষণকেন্দ্রের কিছু অধিক নিকটে তাঁকে পাওয়া যেত)। রবীন্দ্র-রূপরীতির সাধারণ প্রভাব তাঁর কবিতায় সুপ্রচুর, কিন্তু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার চেষ্টা তাঁর ছিল। এই পরীক্ষার পরিচয় তাঁর কবিতায় আছে। কিন্তু সিদ্ধিলাভ কি তাঁর ঘটেছিল? সম্ভবত সিদ্ধি তিনি চানও নি। বিচিত্র বর্ণীন পরীক্ষার বুদ্বুদ উড়িয়ে তিনি খুশি থেকেছেন, মাঝে মাঝে আপন অন্তরের যৌবনের বীর্যকাঠিন্য আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র॥